KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬২ গ্রীন পার্ক, কলকাতা-৫৬
Collection : KLMLGK	Publisher : রাধারমণ মিস্ত্রী
Title : অধুনা (ADHUNA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 10 11	Year of Publication : ১৩৯০ বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯১ বার্ষিক সংখ্যা
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : রাধারমণ মিস্ত্রী, সন্তোষকুমার মালাকার	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অধুনা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক

রাখাল বিশ্বাস

পঞ্চানন মালাকর

অধুনা
সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক
১১শ বর্ষ ঃ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯১

॥ সূ চি প ত্র ॥

প্রবন্ধ

দুর্গোৎসবের সমাজতত্ত্ব
সুনীল দাস

দুই মেরু-দুই কবি
অর্পিতা মিত্র

গল্প

খিদে
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

আনন্দ বাগচী প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত কৃষ্ণা বসু আলোক সরকার ব্রততী সিংহ রায় রাণা চট্টোপাধ্যায় অভী সেনগুপ্ত প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় অশোক চট্টোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় সজল বন্দ্যোপাধ্যায় শুভ বসু মঞ্জুষ দাশগুপ্ত সুনীল বসু ধূর্জটি চন্দ উত্তম দাশ শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাসুদেব দেব রবীন সুর সুজিত সরকার রথীন্দ্র মজুমদার রণজিৎ দেব সুভদ্রা ভট্টাচার্য মলয়শংকর দাশগুপ্ত কমলেন্দু সরকার আরতি সরকার অজিত বাইরী সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাঙ্গ ভৌমিক সুশীল পাঁজা বাসব দাশগুপ্ত গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বৃন্দাবন দাস সুব্রত সরকার অশোক দত্ত চৌধুরী দ্বিজেন আচার্য সত্য বিশ্বাস রঞ্জন ভাদুড়ী বিজয়কুমার দত্ত জয়ন্ত সুকুল শোভন মহাপাত্র প্রদোষ দত্ত কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় সৈয়দ কওসর জামাল কার্তিক বৈরাগী নৃসিংহ মুরারি দে দেবাশিস চন্দ শিবময় দাশগুপ্ত সন্দীপ মুখোপাধ্যায় রমেন আচার্য শ্যামলবরণ সাহা জহর সেন মজুমদার মলয় সিংহ প্রমোদ বসু অজয় সেন অমিতাভ সেনগুপ্ত সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্তিক মোদক দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত রায়।

সম্পাদক ঃ রাখাল বিশ্বাস পঞ্চানন মালাকর
প্রচ্ছদ ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

কার্যালয় ঃ ৩২ গ্রীন পার্ক কলকাতা-৫৬
দাম ॥ দুই টাকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দুর্গোৎসবের সমাজতত্ত্ব

সুনীল দাস

কেউ বলেছেন মহোৎসব, কেউবা হৃদয়োৎসব। সব মিলিয়ে বাঙালির দুর্গোৎসব এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। বিগত দুই শতকে শহর কলকাতায় এক একটা পুজোয় যে পরিমাণ খরচ হতো তাতে নাকি এখনকার একটা পঞ্চবার্ষিকীর খরচের প্রায় সমান। এই উৎসবের স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিলেন সেকালের রাজামহারাজা, জমিদার ও হঠাৎ বড়লোকদের দল। এই সময় ইংরেজ আবির্ভাবের ফলে জমিদারী পত্তন নিয়ে শুরু হল তাদের বাণিজ্য নামক বাঙালির সর্বস্ব হরণের এক চতুরতা। এই আগুনে খড় জোগানোর জন্য ইংরাজরা সৃষ্টি করলো সুচ্ছাদি, দেওয়ার, গোমস্তা জমিদার ও তালুকদার সম্প্রদায়। ফলে জমদিরবাবু ওই সম্প্রদায়ের হাতে এল অঢেল পয়সা। শিল্প বাণিজ্যে এই পয়সা নিয়োগ করে এর সদ্ব্যবহার হয়নি। এই ফাঁকির পয়সা খরচ হয়েছে বাবুদের দুর্গোৎসবে। এই উৎসবে বাবুদের বাড়িতে বসত নাচগানের আসর। সেইসঙ্গে ছুটতো মদের ফোয়ারা তার সঙ্গে রাজসিক ভোজন-পর্ব। লাখ লাখ টাকা উড়েছে নাচ গান জলসার আর বাইজী নাচের আসরে। শুধু পুজোয় নয় এই টাকা খরচ হয়েছে শ্রাদ্ধ, টপ্পা, খেউড় বুলবুলি ও মোরগ লড়াইয়ে। এছাড়া বিদেশী বিদেশীদের তোষণের জন্য নানারকম উপঢৌকন এবং উৎসবে এদের মনোরঞ্জন করতে খরচ হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। খরচ হয়েছে দরিদ্রনারায়ণ সেবা নামে এক দাম্ভিক প্রতিযোগিতায়। এইভাবে দুর্গোৎসব জাতীয় জীবনের বিচিত্র প্রকাশ না হয়ে, হয়ে ওঠে ধন-দৌলতের বিকৃত ফ্যাশান। হঠাৎ ধনী সম্প্রদায়ের এই বিকৃত রুচি সমাজ জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলেই ঈশ্বরগুপ্ত যিনি প্রথম বাঙালি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্য হল ওরেল সাহেব এর দেড়শ বছর আগেই এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর ইন্টারোলিং হিস্টরিক্যাল ইভেন্টস গ্রন্থে।

এছাড়া এদের সমালোচনার সেকালের রক্ষণশীল কাগজপত্র ও ব্রাহ্মদলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দুর্গোৎসবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ছিল অমঙ্গলে আচ্ছন্ন, এরকমই মন্তব্যই করা হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঃ দুর্গোৎসবের উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও

প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতিবৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এ দেশে সম্বৎসরে যত দুষ্কর্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়। এই সকল দুষ্কর্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষম অপরাধের হেতু হইয়াছে।...পূজার তিন দিন পাপের স্রোত বইতে থাকে। এই তিন দিনে শতশত নারীর অবসন্ন হয়, মন দুর্বল হয়, নীচ প্রবৃত্তি সকল প্রদীপ্ত হয়। 'এ প্রকার ঘটনাও হয় যে যাঁহারা যে নদীতীরে বিজয়ার আমোদে উল্লসিত হইয়াছিলেন, পরদিবস তাঁহারা সেই নদীতীরে চিতারোহণ করিয়াছেন।' অতএব পূজো হোক! কিন্তু বাদ দেওয়া উচিত এই ধরনের বেলেল্লেপনা। এই সত্যকে সেকালের বহু কাগজপত্র এবং চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজ শুধু মেনে নেননি এনিয়ে রীতিমত আন্দোলন করেছেন। তবে 'সোমপ্রকাশ' ব্রাহ্মদের এই সমালোচনাকে পাত্তা দেয়নি। ব্রাহ্মদের সম্পর্কে এই কাগজে একবার মন্তব্য করা হয়েছিল ব্রাহ্মদলের অস্তিত্ব লোপ এবং ব্রাহ্মমন্দির ভূমিসাৎ হলেও হিন্দুর জাতীর উৎসব দুর্গাপুজোর এই উল্লাস কোনমতে মিলিয়ে যাবে না। 'তবে পেচকেরা চিৎকার করিবে বাটীর গৃহিণীরা এই অলক্ষণসূচক পক্ষীর মুখবন্ধ করিবার উপায় জানেন।' প্রায় একশ দশ বছর আগের এই মন্তব্য আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। পুজোর জৌলুস কমেনি, বেড়েছে। সবই আছে বদলেছে শুধু মাত্র রীতি। সেসময় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন দুর্গোৎসবকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উন্মত্ততাকে ঘৃণা করেছেন। শিক্ষিত যুবকদের কাগজ 'জ্ঞানান্বেষণে' এই মহোৎসবের সামাজিক দিকটি উন্মোচিত হয়েছে যথাযত।

দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু উল্লাস নয় এই পুজোকে কেন্দ্র করে কেনাকেটা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিরাট অর্থ নৈতিক দিক। সেদিকটি মোটেই অবহেলার নয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করলেও 'এ কার্যতে স্বদেশীয় লোকের দিগের আহ্লাদেই আমরা আহ্লাদিত আছি।' তবে এই পুজোতে অহেতুক অর্থব্যয় এবং নাচ-গানের মাধ্যমে চিত্তবিনোদনকে ভাল নজরে দেখেনি। এবিষয়ে পত্রিকাটির বক্তব্য হল—'নাচ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে যাহা দুর্গোৎসবের কালে হইয়া থাকে তাহা ধর্মের অংশ নহে এবিষয়ে আমার দিগের সহিত যে দেশস্থ লোকেরা ঐক্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই তবে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি এবং বোধ হয় দেশস্থ মহাশয়েরাও শুনিতে পারেন যে সকল ভারি-ভারি

বিষয়ে তাঁহার দিগের সাহায্য করা এবং তত্ত্ব নেওয়া আবশ্যক যে সকল বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া নাচ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ে কি জন্যে ব্যয় করিতেছেন তাহারা কি সর্বসাধারণের উপকার যোগ্য এমন কোন বিষয়ে দেখিতে পান না যে ঐ সকল বিষয়ে তাহার দিগের সাহায্য করিতে হয়।...নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্ত্তন করিয়া যে ধন বাঁচিবে ভারতবর্ষীয় লোক দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থে হইয়াছে তাহাতে দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্প যন্ত্র এবং দেশের চাষ বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মত যদ্যপি নূতন নূতন অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেননা ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন।'

জ্ঞানান্বেষণের এই সুচিন্তিত মত সেকালের পুজোর উদ্যোক্তারা গ্রহণ করেননি। তবে উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে পুজোর জৌলুস কমে আসে। শুধু অর্থ নৈতিক বিপর্যয় নয় যৌথ পরিবার ভাঙন ধরেছে। কালক্রমে দুর্গাও বাবুদের দুর্গাদালান থেকে নেমে এসেছেন রাস্তায়। হয়েছেন সর্বজনের। সার্বজনীন।

দুই মেরু—দুই কবি

অর্পিতা মিত্র

একটা নির্দিষ্ট পর্যায়, নির্দিষ্ট সময়ে রচিত সাহিত্য কর্মের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু পূর্ব প্রাসঙ্গিকতা এসে যায়। প্রাসঙ্গিকতা এই অর্থে, গুণগতভাবে সাহিত্যের সামগ্রিক অবয়বে যা পরিশীলিত, সৃজনশীলতার মানসিক অংশের সঙ্গে আত্মিকভাবে (Spiritually) সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ব্যাপক অর্থে সময় উদ্ভূত দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বের গঠনগত বিন্যাস এবং তার নান্দনিক প্রাকাশভঙ্গির মাধ্যমে যেমন সাহিত্য মূল্যায়ণের মানদণ্ডটি জ্ঞাত হয়, তেমন ঐ একই দ্বন্দ্বের সাহায্যে সামাজিক জীবন পদ্ধতির সামগ্রিক বোধকে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বন্দ্বের যেহেতু স্থানিক-কলিক এবং কৌণিক রূপ আছে, সেইজন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। পুরনো বিষয় (Content) নতুন আঙ্গিকের (Form) প্রয়োগে নতুন রূপ লাভ করে। আবার বিষয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গিকের বৈচিত্র্য অন্বেষণও পূর্ণতা পায়। আর এই কারণেই বিষয় এবং আঙ্গিকের ভারসাম্যই সাহিত্যকে গুণগত দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এইখানেই আধুনিকতার অনিবার্যতা।

অক্টোবর বিপ্লব শিল্প সাহিত্যে বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিলো। ত্রিশ চল্লিশ দশকের বাংলা কাব্যে তার সংবেদনশীল প্রমাণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু পঞ্চাশে পৌঁছে কবিতা হয়ে পড়ে দিশেহারা। আরম্ভ হয় সঙ্কট তথা কবিতার সঙ্কট। পঞ্চাশের কবিরা শব্দে আনেন আধুনিকতা ; শব্দ বিন্যাসে সংযোজিত হয় শ্রুতিমধুর যাত্রা ; কবিতা হয়ে ওঠে শব্দ-নির্ভর কিন্তু অপরিবর্তিত বিষয়ের (Content) উপর আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সাহিত্যের গুণগত রূপান্তর-এর প্রশ্নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

ষাটের কবিতা নিয়ে শুরু করেন ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কবিতার বাহ্যিক সাজ পোষাক, কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপসৃষ্টি অথবা আত্মগত কণ্ঠ—কোনকিছুর মাধ্যমেই কবিতাকে স্থায়ীত্বের পথে নিয়ে যাওয়া যায় না। কবিতা ক্রমশই মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

সত্তরের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা সাহিত্যে গুণগত পরিবর্তনের প্রশ্নে

এক দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই সময়ের উন্মাদনা, তার স্ব-বিরোধিতা, তার ব্যর্থতা এই সময়ের শিল্প-সাহিত্যে যে বাস্তবমুখী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তাঁকে অসম্পূর্ণতার পথে ঠেলে দেয়। সেইজন্য কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিদের এক ব্যাপক অংশ যখন প্রভিবাদের মাদকতায় কিছুটা সুচিন্তিত ভাবেই চঞ্চল, এই অবস্থায় সাহিত্যের এই সামাজিক বলয় থেকে দূরে সরে গিয়ে কবিতার আরেকটি বলয় সৃষ্টি হতে থাকে। আবেগ তাড়িত কণ্ঠে বাস্তব চিত্রকে সরাসরি সাহিত্যে স্থান দেওয়ার পরিবর্তে বেদনাময় সমাজ জীবন কবিতায় রূপাবয়ব লাভ করে শব্দের মননশীল গঠনের মাধ্যমে। পঞ্চাশের শব্দ নির্ভরতাই যেন মেধাশ্রিত প্রয়োগের বিন্যাসে ফিরে আসতে চায়। সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে শব্দ ব্যবহারের এই মননশীল গঠন কবিতাকে কিছুটা আপাতকালীন স্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়।

সত্তরের কবিতার এই অবয়বে কয়েকটি নাম পাঠকের কাছে ভেসে আসে। মৃদুল দাসগুপ্ত ও জয় গোস্বামী এদের মধ্যে অন্যতম। দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গীর অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে হওয়া সত্ত্বেও বৈপরীত্যের আকর্ষণেই কোথায় যেন তারা বাধা পড়েন ; কবিতা শব্দাশ্রিত হয়েও মেধার স্বাক্ষর বহন করে চলে।

সত্তরের শেষভাগে যখন কিছুটা মোহভঙ্গ ঘটেছে দীর্ঘ উত্তেজনার পর নিস্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে মস্তিষ্কে, সেই সময় মৃদুলের কবিতায় ফুটে ওঠে কবিমানসের এক উৎক্ষিপ্ত আবেগপূর্ণ চিত্র—কোনদিন কিছুই ছিলো না, কিছুই কিছুই নেই আমাদের আজ আমরা কি বাজাবো না জলপাই কাঠের এসরাজ ?…

(জলপাই কাঠের এসরাজ)

কিন্তু এই একই সময়ে লেখা জয়ের কবিতায় সম্পূর্ণ অন্য সুর,

…ত্রিকোণ ফলার মুখ যেন ফিরে ফিরে আসে ডুবে যেতে মাংসের গরমে।
নির্জন জন্তুর মতো তোর ঘরে বসে থাকি, সারারাত্রি ক্ষরণ, ক্ষরণ…

(বন্ধুকে রাত্রির চিঠি)

কখনো কখনো কবিতার বিষয়বস্তুকে পাঠকের অনুভূতির গভীরতম স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মৃদুল করিতায় নিয়ে আসেন চমকীয়তা—

এই দেশে ক্যামেরা-লাঞ্ছিতা হতে ফুল ফোটে হার্টিকালচারে ;
ফুল অর্থে মূর্খতা মাখানো সেই কাব্য, গীতবিতানের উড়ু-উড়ু অক্ষয় মৌমছি ;

(ফুলের বিরুদ্ধে)

বাক্যের এই পরিশীলিত রূপ চমকীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্রমশঃ তা ফুটে ওঠে সমাজ জীবনের রূঢ় চিত্রের মাধ্যমে—

…চক্রব্যূহের মধ্যে ছুটে আসছে বহু তীর, অসংস্কৃত ভীমভল্লা
ছুটে আছে মফঃস্বল যুবকের জীবন-চরিত ;
মফঃস্বল কি খুব শান্ত, অথবা ভেতরে উষ্ণ, ডিডিটি ও তাইচুঙে
অশনি সংকেতে ··
(ফুলের বিরুদ্ধে)

জয়ের কবিতায় এই হঠাৎ চমক নেই। বরং নম্র মেজাজী কণ্ঠেই ফুটে ওঠে তার স্বকীয়তা—

যদি জলতল থেকে উঠে কোন কুমারী জরায়ু / মর্মর দেহের মধ্যে গিয়ে ফের এদের কাউকে ঋতুমতী / করে তোলে, তাহলে আবার তার প্রতি / ফোয়ারা আমি যাবো, আমার সমস্ত বীজ ভরে দেবো রাত্রি ভোর…

জয়ের কবিতায় যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং 'কাম' এর তাড়নাই যেন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে চায়। তাই তার কবিতা সম্পর্কে বলতে ইচ্ছে করে 'subjectivism' সব সময় নিছক আত্মরতি নয়। সমষ্টির সঙ্গে একাত্মীভবনের প্রশ্নটি কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবিরোধ যেখানে জীবন বিরোধে রূপান্তরিত হচ্ছে সেখানে সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলোর পরিবর্তে মনের ক্ষতর দিকে নজর দেওয়াটাই জয়ের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য—ভেসে ভেসে ঘুরে যাই সাঁকোর তলায় / অথচ উপর থেকে পা ঝুলিয়ে ওদের আটকে / মাসি বললে রেগে যেতো / কাকীমা বললেও তাই / একদিন চরম রেগে উঠে / শাড়ীর নীচে কি আছে বুঝিয়েছে সবটুকু, আমার পিঠের মাংসে ঢুকে গেছে নখ (রেনট্রি)

ব্যক্তি সম্পূর্ণতার সুস্থ লক্ষণের পরিবর্তে অসুস্থ অহংবোধ কখনো কখনো জয়ের কবিতাকে 'মেগালো ম্যানিয়াক' করে তোলে—

মাঠে আসলাম তার কারণ, এইবার তৈরী করেছি পিদিম এবার দেহের চর্বি ঢেলে দেই ওতে। যতটুকু দাহ্যগুণ এখনো রয়েছে তাও ওই মৃত জলে মেশবার আগেই দেশলাই জেলে ধরিয়ে দি রক্ত হাড় চর্বি শেষবার… (ছাই)

প্রকারান্তরে মৃদুলের কবিতায়, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক অসমবিকাশ, সামাজিক রাজনৈতিক স্ব-বিরোধীতা সমাজ জীবনে যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে তার যেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—খবর কাগজ দিয়ে আর লুকিয়ো না মুখ ও মুখোশ,

বাবুমহাশয় বলো, ইস্কুলে আমি কোন কোনদিনও পাইনি স্বাধীনতা দিবসের খাবার প্যাকেট ! (মুক্ত মানুষের পদ্য)

পাশাপাশি কবি সত্বার আত্মবিকাশের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয় ভাবে ফুটে ওঠে—

…গরল আমি ডরাই না হে
বিষে আমি ভয় পাই না

আমি মৃদুল দাশগুপ্ত, আমি আরব গেরিলাদের সমর্থন করি
(মুক্ত মানুষের পদ্য)

কিন্তু এই অহংবোধই তার কবিতায় শেষ কথা হয়ে ওঠে না। একাকীত্বের শাশাপাশি চলে সমষ্টিগত ভাবে একাত্মীভবনের প্রচেষ্টা—

…লুঠে নেবো হ্রদ, টিলাগুলি আমি জঙ্গী
দূর বন পথে ঝরে ঝরে যাবে রঙ্গন…
ছোটাবো তুফান ঘোড়াটি, যাবে না সঙ্গে…
(বিবাহ প্রস্তাব)

মৃদুলের কবিতার সংগীতময়তা বা জয়ের কবিতার মেজাজ পাঠকের মনে তাৎক্ষণিক আবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হলেও তা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। শব্দ অন্বেষণের অতি প্রবণতা বা শব্দ-নির্ভতা মৃদুলকে যেমন বহুক্ষেত্রে বিষয়ের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, জয়ের একাকীত্ব বোধ, সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের অস্তিত্ব কল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী তেমন রূপ (idea) এবং আবেগ (emotion) এর বৈসম্য সৃষ্টি করে। এই দুই তরুণ কবি ইদানীং তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি কাটিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন এটাই সুখের কথা। কবিতার গুমোট আবহাওয়া এভাবেই দূর হবে বলে আশা করা যায়।

আনন্দ বাগচী

নিশ্চল একাকী

পুজোর কদিনমাত্র বাকি ওরা হোল্ড অল বেঁধেছে
ঝড়ি ব্যাগে টাইমটেবিল, ম্যাপ, ভ্রমণের বই
ট্রেনে বসে পাতা ওল্টাবার জন্যে রাখা।
রক্তের ভেতরে দূর সমুদ্রের নুন, ঢেউ, রঙীন ঝিনুক,
স্নায়ু জুড়ে পাহাড়ী ঘোরার
ক্ষুরধ্বনি। বিদায় কলকাতা।
রুমাল উড়বে একটু পরে। তার আগে
স্বপ্নে যেন, স্বপ্নে সম্ভবত
নীল উপত্যকা আর খাদ ছুঁয়ে দুরন্ত কড়াই,
তুষারের গুঁড়ো দুধে সদ্য ঘুম ভাঙা গ্লেসিয়ার
ডাকে। যাকে চিরদিন ভীষণ ডেকেছে।
উৎকর্ণ রয়েছে তৈরি ট্যাক্সির হর্ণ শুনবে বলে
ফিতে বাঁধা জুতো আর দাঁতে দাঁত চাপা যেন ব্যাগ
বুক পকেটের লিস্ট, টুকিটাকি, জলের বোতল।
পুজোর কদিন বাকি জেনে গেছে ট্র্যাভেলার্স চেক,
হোল্ড অলের পক্ষিরাজে অপেক্ষায় বসে থাকা শিশু
নিশ্চয় জানে না
কোন ভূগোলের মধ্যে তেপান্তর লুকিয়ে রয়েছে,
পলক ফেলছে না কেন পাশের বাড়ির খড়খড়ি!
পাড়া ফাঁকা করে ওরা চলে গেল, প্রতিবার যেরকম যায়।
ঢাকে কাঠি প্যাণ্ডেলে স্পিকার
ভাঙাচোরা কলকাতায় পুজো এলো
সত্যি সত্যি পুজো এলো,
ভাদুরে রোদ্দুর খাওয়া বেনারসী রাস্তায় বেরলো।
কেবল আমি না।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সাপ

দমদম—এয়ার পোর্টে কনভেয়ার-বেল্টের মধ্যে একটা সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে,
তাকে কেউ ধরতে পারছে না, এমনকি সাপুড়েও নয়,
সমস্ত সময় যাত্রীদের মুখে ভয়, এই বুঝি ফণা তুলে ছোবল লাগালো,
ভালো কি কথনো লাগে এই সব অপ্রত্যাশিত জায়গায় সাপ সাপিনীর
আনাগোনা,
তবু তো অদ্ভুত বিষ মাঝে মাঝে আমাদের তাড়া করে ফেরে—
আখেরে কী হবে তা বলা সক্ত ; নিরাসক্ত, নির্মোহ পাতার মতো
হয়তো ঝরে পড়বে কারো কারো স্খলিত জীবন। তবু মন বলে,
এরকম হবার কি কথা ছিলো' কেন সাপ তাড়া করবে বেল্টের ভেতরে
কেন লোহার তৈরি ঘরে ফুঁটো থাকবে, চলে আসবে নাগিণী মনসা ?

কৃষ্ণা বসু

সে কি শুধু তোমার মহিমা ?

কোনোদিন সমাদর করোনি আমায় ;
তবু আমি তোমার কাছেই আসি, কেন আসি নিজেই জানিনা ;
উদাসীন বসে থাকো অনিছুক,
নাছোড় মাছির মতো আসি আর ফিরে ফিরে যাই,
এতদূর হেয় করি নিজেকেই সেকি শুধু তোমার জন্যেই ?
নাকি নিজের গভীরে যেই নষ্ট শোক,
যেই আঘাতের উপজীব্য ক্ষুধা রয়ে গেছে,
তাকেই লালন করব বলে এইখানে তোমার সমীপে এসেছি ?
বিষাক্ত মদের প্রতি মাতালের যেরূপ নিবিষ্ট টান,
সেই রূপ কোনো টান আছে নাকি
এই রূঢ় উদাসীন তোমার ভঙ্গির দিকে আমার ভিতরে ?
কিছুই জানি না ; শুধু অপমান পাশে বসে,

বেঁচে আছি, শোকে আছি,—রসরক্ত মরণের মধ্যে আছি,—
এই বোধি পেয়ে যাবো বলে, বারবার তোমার সকাশে আসি,
ততদূর কাঙাল নইকো, তবু কাঙালের মতো চাই
তোমার মুখের দিকে, সে কি শুধু তোমার মহিমা ?
নাকি আমার ভেতরে যে গূঢ় লোভ বেদনা মন্থনের দিকে
ঝুঁকে আছে তার টানে, চলে আসি নিজেই জানিনা ;
কোনোদিন সমাদর করোনি আমায় তবু
তোমার কাছেই আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি—

আলোক সরকার

স্রোতস্বিনী

যেন পরিশ্রমসাধ্য কিছুই নয়, যেন কোথাও কোনো
প্রয়াসই নেই এইরকম অবহেলায়
সারা মাঠ ভরে গিয়েছে রৌদ্রে হেমন্তের প্রথম দিকের
রৌদ্র তা তেমনই অনভিলাষ
যেমন ওই পাথরগুলোর মাঝখানে স্রোতস্বিনী, তা
নিশ্চয়ই একটা প্রাণনা যখন আমাদের অভিনিবেশ
বুঝে নিতে চাইছে প্রাণনা।
কেন বুঝে নিতে চাইব না প্রাণনা ? যখনই বুঝে নিতে চাইব
তখনই শিশিরস্পর্শ সেই হাওয়া
দুটো তিনটে জামরুলগাছের পাতা ঝরিয়ে, যেন পাতা ঝরার
কথাই ছিল এইরকম অনুমন আর নিরুত্তাপ আলস্যে
পাতা ভাসিয়ে দিয়ে পুবদিকে
অপরিসীম স্পষ্ট করবে সেই রৌদ্র, কতো বড় একটা
হেমন্তকাল, অবিমিশ্র আর
ঠিক ততটাই নিশ্চিত যেমন পাথর ঘুরে ঘুরে চলেছে

স্রোতস্বিনী, আবহমান নিরন্তর একটা চলা যা এমনই আবশ্যিক
তা কোথাও স্পষ্ট করছে না আবশ্যক।
কেন বুঝে নিতে চাইব না প্রাণনা ? ভাসতে ভাসতে
পাতা চলে যাচ্ছে পুবদিকে
কত কত পুবদিকে চলে যাচ্ছে পাতা—ভেসে চলে যাচ্ছে কত কত স্রোতস্বিনী।

ব্রততী সিংহ রায়

সেই পাখি

সমস্ত বিষাদ নিমেষে সমর্পিত
এক নিষাদের তীরের ফলায়
খুব বেশী দুঃখ-কাহন সুখের মাত্রা তীব্র ছড়ায়
যদি বুকের পাখি মৃতই থাকে
নিষাদ সে তো জেনেই রাখে
বাইরে তাকে বিদ্ধ করা—এ কৌশল মন্দ কি আর
সঞ্জীবনী সুধা এনে
গড়তে হবে বুকের পাখি
ধ্যানমগ্ন সন্ধ্যাতারা জলবে সেই পাখির চোখে
সূর্য দেবে অগ্নিগোলক ডানার মধ্যে মন্ত্র কবচ
বিস্তারিত সাগর ফেনা বাজবে সেই পাখির বুকে
ঠোঁটের কাছে ঝুলবে তার মুক্তাফল
পায়ের কাছে অবোধ শেকল
জানু ভেঙে লুটিয়ে যাবে

সেই স্বাধীন নীল পাখি
চোখে মণির লাল দ্যুতি যার
বুকের মধ্যে বাঁচবে বলেই বাসা বাঁধে

যখন তখন
নিষাদ যদি শাণিয়ে রাখে তূণের ধার
মাঝে মাঝে সেই পাখিটার জন্যে শুধু
একলা কেঁদো।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আজকাল

আজকাল আমাদের দূরত্ব বেড়ে গেছে
কাছাকাছি আছি
কাছাকাছি থেকেও অচিন ও অস্পষ্ট
বিভাজন
কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়াওঠে, রাগ ওঠে
কথাওঠে, অনেকদূর পর্যন্ত চলে যাই
আঙুল প্রতিবাদ করে, চোখ প্রতিবাদ করে
অশ্রুরাকৃতি হ্রদ তৈরী হয় বুকের ভেতর।
আজকাল আমাদের দূরত্ব বেড়ে গেছে
কেন কাছাকাছি থাকি
কাছাকাছি শোয়ার ও বসার কোন অর্থ নেই
ভালবাসা নেই, বিষণ্ণতা নেই
একা-একা হারিয়ে যাওয়া নেই, নিয়মের
আবর্তন
কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে, আঙুল তুলে
প্রতিবাদ করতে যাই
দেখি, ভাঙা আয়নায় চোখে, নাক, মুখ
বিভৎস ও ভয়ংকর হ'য়ে উঠছে
আজকাল আমাদের গাঙুরের জলে
ভেসে যাওয়া ভাল।

অভী সেনগুপ্ত

কতজন্মের আত্মীয়

অরণ্যের সভ্যতা আসতে চায় এই শরীরে সবুজ ঢেলে দিতে
—কী দিয়ে মুখ দেখবো তার
আমি বিকেলের দিকে—বালি, নাবালক ঢেউ আর চুনো মাছে-ভরা
স্বাবলম্বী নদীটির দিকে হেঁটে যাচ্ছি অশরীরী
ক্ষুধা নেই, ভব্যতা উধাও, আনমনা শিষের মতন যে ফুরুৎ পাখিটা
নাগরিকতা অতিক্রম ক'রে উড়ে যায় এইমাত্র
স্তব্ধতার দূত হয়ে
তা-কে মনে হয় কত জন্মের আত্মীয়
অরণ্যের সভ্যতা আসতে চায় এই শরীরে সবুজ ঢেলে দিতে
—ঝলসানো জীবন দিয়েই মুখ দেখবো তার।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দস্যুরোদ ঝড়ো হাওয়া

কে ওই মর্গের ঘরে অজ্ঞাতকুলজী
পড়ে আছে আলো-অন্ধকারে।
ভালো করে ছাখো, তাকে ছাখো, হয়তো মনে হতে পারে
এই হয়তো সেই, যার খোঁজই
এতকাল যাচ্ছিল না পাওয়া।
যাকে চুরি করেছিল বিগত গ্রীষ্মের ঝড়োহাওয়া
সমস্ত প্রত্যঙ্গ যার ছিন্ন ভিন্ন, আজ শেষবার
সবটুকু জোড়া দিয়ে ছাখো, যদি তার
শরীরের কোনো রন্ধ্রধারে
ফুটে ওঠে চেনা চিহ্ন, আমাদের সাবেকী সংসারে
লুপ্ত পরিচয় সেই নিরাপত্তাবোধ—
যাকে চুরি করেছিল বিগত গ্রীষ্মের দস্যু রোদ।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা

জীবনে যদি কভু বর্ষা আসে প্রভু
রেখো হে স্মর্ষের পাহারা।
বসন্ত উতরোল যদি বা দেয় দোল
হৃদয়ে রেখে তবু সাহারা॥
বাঁধন দাও জোরে পুলিশে ও চোরে
যেন না হয় ছাড়াছাড়ি।
আসিবে প্রিয়জন যখনই প্রয়োজন
শূন্য থাকে তাড়াবাড়ি॥
হরিণ-হরিণী তো খেলিছে নিয়মিত
খোকারা হতেছে বাবা ঠিক।
শহরীয়ানা ব্রতে ভাসিছে নানা স্রোতে
এখানে নয় কিছু স্বাভাবিক॥
শরীর বাদ দিলে পোষাক আধ ঢিলে
এ কথা জানে সব বাচ্চাই।
ঘেরো হে দিয়ে তার সিনেমা থিয়েটার
এখন কিছু ভাল গাছ চাই॥
জীবন ভাস্যের এখন আধসের
হবে যে সাদা রঙ মেশাতে।
ছবিঘর মেট্রো মুদে থাক নেত্র
ক্যাবারে ভরে যাক হ্রেষাতে॥
পদ্যে দর্শন-তত্ত্ব জীবনে ধর্মের গর্ত
কেশর রবে নাসিকাতে।
অদ্য যদ্যপি সব চাইবে সদ্য বিশপ
ঝুলতে হবে ফাঁসি কাঠে॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবিকর্ম

(কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রদ্ধাস্পদেষু)
এক সঙ্গেই ডুব দিয়েছিলো তাঁরা ; কেউ
মুঠোয় তুলেছিলো মুক্তো, কারো হাতে ফাঁকা
ঝিনুক ; কারো
পা গেছে জড়িয়ে শ্যাওলায়, কেউবা
স্রোতের টানে গেছে ভেসে, ঘূর্ণিতে
কেউবা গেছে তলিয়ে
যে মুক্তো তুললো, তার সিংদরজার রাজার রথ
এসে থামে
সোনার থালায় রাজকন্যার উপচার
রক্ত আবীর, লিখন,
তাকে ঘিরেই বন্দনা নৃত্য দেবদাসীর
কবি ভাবছেন, বশীকরণ মন্ত্র তো তার
মুঠোয়, এখন—
ভূতের ঘাড়ে চেপে ঘুরে বেড়ানো
কুড়িয়ে নেওয়া ইনাম, রাজকণ্ঠের মালা, এখন—
ছড়ানো ধান ঘরে তুলবার সময়
এখন
হাই তুললে সোনার থালা পাতে ভক্তের দল,
ঝরে থুথু ; তা-ই
মণিমুক্তো ভেবে সঞ্চয় করে ওরা, ভাবে—
হাটের বাইরে বুড়ো অশথের নিচে সে
বসে আছে, সেও ওদের
প্রিয় হতে পারতো, সে—
একা
যার হাতে উঠলো ঝিনুক, ভাবলো সে

তারও হাতে মুক্তো উঠতে পারতো, কেন
পা জড়িয়ে গেলো গুল্মে, কেন—
উঁচুতে তুলে ধরা মুঠোয়
গুচ্ছ গুচ্ছ শূন্যতা ?
হাটের বাইরে অশথ গাছের নিচে
বসে থাকা মনুষটি হয়তো
জানে না—
তারই মুঠোয় তারারা দিচ্ছে ধরা ! একদিন—
তারই মাথায় মুকুট উঠবে ঝলসিয়ে ; সে দিন
সে-ই হয়তো থাকবে না !

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিধুবাবু

আমার বেঁচে থাকার জন্যে
তুমি দায়ী।
আমার নেশার জন্যে
তুমি দায়ী।
আমার ঘর থেকে বাইরের জন্যে
তুমি দায়ী।
আমার মৃত্যুর জন্যে
তুমি দায়ী।
তোমাকে ভালবাসার জন্যে
আমি দায়ী।

শুভ বসু

রদ্যাঁর জগতে

১। "উদ্যত হাত, মিনতিময় লোক॥ (৭৭)
মৃত্যুর বিশাল থাবা বেঁকে চুরে, বিষাক্ত দাপটে
প্রচণ্ড গর্জায়, নতজানু সে মানুষটির
ভঙ্গিতে কি আর্তি না কি স্থায়ী জেদ, না কি
মরীয়া লড়াই-শেষে অনুগত আত্মসমর্পণ ?

২। "চিরপ্রতিমা" (৭৩)
সুঠাম তরুণ ঠোঁট রেখেছে বুকে।
ধাতব সে ঠোঁট ধাতব সে বুক থেকে
উৎসারিত চিরন্তনের আলো।

৩। "জ্যানায়েড" (২১)
নরক উজাড় ক'রে এরা সব এসেছে এখানে।
মেয়েটি তবুও এত মোহনীয়া, প্রেমিকহন্তার
পাপের শাস্তির পরিণামে
যখন উপুড় হ'য়ে লুটিয়ে পড়েছে ভাঙা, পরিত্রাণহীন,
তখনো শরীরে তার অনির্বচণীয় খাঁজগুলি
গানের উপমা যেন, শরীরিণী বসন্তবাহার,
—নরকের সবচেয়ে কঠিন কৌতুক।

৪। ইভ (১২)
মুখ ঢেকেছ বিক্ষোভে, লজ্জায় ?
তোমার পাপেই এই নরকরচনা ?
এখন সমস্তকাল সেই সৃজনের সাক্ষী
হ'য়ে থাকা পরিত্রাণহীন ?
সমকামী নারীদের স্বেদ ও শীৎকার,
সদ্য সঙ্গমের মুদ্রা স্থায়ী যন্ত্রণায় ধ'রে রাখা,
মানুষের আত্মজ-রক্ত পানের পিপাসা,
সমস্ত জীবনভর পাথর বহন ক'রে যাওয়া,

অনিবার্য নরকের এরকম হাজার হাজার
দুরারোগ্য দৃশ্য দেখে তোমার বিপন্ন মুখ-ঢাকা ?
সমস্ত পাপের জন্য দায়ী ভাবা নিজের পাপকে ?
গোপন জনন দ্বার তবুও মহিমাময় লাগে।
(ডানপাশের বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাটি কলকাতার রদ্যাঁ-প্রদর্শনীতে মূর্তিটির ক্রমিক সংখ্যা)

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

সুব্রত

(সুব্রত রুদ্রকে)

কী এক আবেগে তার হীরের আঙটিটি
ছুঁড়ে দেয় সুব্রত তখন
লোডশেডিং-এর অন্ধকার
দিয়েছে চতুর্থী চাঁদ ফিকে করে—
আঙটিটি কুড়িয়ে নিয়ে পিছু পিছু যাই
এলোমেলো কথাবার্তা
নেশাখোর মানুষের বুক
ভেঙে ভেঙে উঠে আসে
হঠাৎ সে ঢুকে পড়ে লেকের ভিতরে
এবং অদৃশ্য হয় ভৌতিক জ্যোৎস্নার আবছায়া ধরে
আমার চীৎকার ভাসে থিরথির পাতাপড়া শব্দের থাবায়
কোথায় সুব্রত !
মানুষেরা ঘুষ খায়, মিথ্যেবাদী সময়ের হাতে
নিজেদের তুলে দেয়
সম্মান টম্মান সব ঘুমের গভীরে ডুবে থাকে
সকলেই আজ ব্রতচ্যুত—
সেই একই আমার চীৎকারে
ফের ডেকে উঠি
কোথায় সুব্রত !

সুনীল বসু

আইন স্টাইন, সত্যেন বসু এবং আমি

অঙ্ক বিষয়টা জানা একটা ব্যাপার
অঙ্ক বিষয়টা না-জানাও একটা ব্যাপার
আমার ধারণা, মানে, আমার মনে হয়,
যারা সত্যি অঙ্ক জানে তারা বোকা হয় না,
এবং হয় দিব্যি চালাকচতুর, ছট্‌ফটে, চৌখস,
আর যারা সত্যি অঙ্ক জানে না তারা হয় পয়লা নম্বর বোকা বা হাঁদা
তারা হয় ফ্যালফেলে, জুল জুলে, এবং নিরীহ, এবং
গোবেচারী, বেহিসেবী, ভারী ভিতু-ভিতু ;
অবশ্য আরও অনেক ব্যাপার আছে
এই অঙ্ক জানা এবং না-জানা বিষয়টির অন্তরালে ;
অঙ্ক ভাল জেনেও বোকা সেজে থাকা এক জিনিস
যেমন আইন স্টাইন বা সত্য বোস
এঁদের দুজনেরই চুল দুধের মতন সাদা এবং এঁরা নমস্য
দুজনেই অঙ্ক শাস্ত্রের পিতা মানে বাবা, কখনো ঠাকুর্দা।
আর অঙ্ক একদম না জেনে যারা খুব চালাক হয়ে
ঘুরে ফিরে বেড়ায় মানে পয়লানম্বর
উপরচালাক, তার একটা সেরা নজির
যেমন ধরুন আমি, এই আমি,—
মানে অঙ্কের কাছে একেবারে যে কেঁচো।
এখন ভাবুন জিনিস দুটো কেমন আশ্চর্য-আশ্চর্যের
আমি কেমন সেজে থাকা চালাকচতুর
চটপটে-এবং অঙ্ক কিছু জানি না
মানে অঙ্কের অ পর্যন্ত
আর 'আ' মানে আইন স্টাইন—মানে অঙ্ক সাম্রাজ্যের বাবা
কেমন অঙ্ক কিছুই না জানা ভাব করে
বোকা বোকা সেজে বিনবিনে কান্নার মতন ব্যায়লা বাজাতেন।

আইন স্টাইন আর আমি সুমেরু আর কুমেরু।
আর একটা কথা, খাঁটি অন্ধ জানা সাজা বোকাকে ঠকানো অন্ধের-
মতই কঠিন,
আর সাজা-চালাক এবং সত্যি অন্ধ না-জানাকে
ডিগ্‌বাজি খাওয়ানো জলের মতন সোজা ফুলের মতন স্বাভাবিক।

ধূর্জটি চন্দ

রমণীয় ফুলস্কেপ

প্রেমের কেশর ছোঁয় হৃৎপিণ্ড, মানুষের শির
যাকে ছোঁয় জেনো তার সুনিশ্চিত কপাল পুড়েছে ;
তবুও তো মানুষেরা উম্ ছায় চুমু-টুমু খায়
ঘাতক বয়স্ক হর, অবিকল মানসপ্রতিমা।

কেউ কেউ পশু হয়, ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দ্রুত,
মানুষ বলেই তারা সব শোষে ভালবেসে বেসে ;
অতঃপর একদিন ফিরে যায় গৃহস্থ উকুন
অন্ধকারো বিছানায়, খিদে বাড়ে, হিংস্র হয় মুখ।

একজন মানুষের রমনীয় ফুলস্কেপ এই,
অপেক্ষায় থাকে যেন আস্তাবলে খঞ্জ এক ঘোড়া
সমর্পণে চোখ বোঁজে, সহিসের লোভাতুর হাত
তাজা খুন ছেনে নেয়, শিশি ভরে অর্থ পিপাসায়।

তোমার সকল গেছে, আরো যাবে, যাবে ভেজা বুক
সাবধানে থেকো তাই, ছাখো যেন ছুরিটা না বেঁধে,
একলা তোমাকে রেখে যদি যায় তোমার প্রতিমা
সে তো বেশ স্বাভাবিক, কাকে কবে সন্তান চিনেছে !

উত্তম দাশ

স্বর্গে যাচ্ছি

তোমরা দেখো আমি পুড়তে পুড়তে
কয়েক টুকরো কয়লায় পরিণত হচ্ছি
আমার হৃদয় নাভিকুণ্ডলীতে জট পাকিয়ে আছে
পোড়া একটা অঙ্গার শান্তির জন্য গঙ্গার দিকে ছুটে যাচ্ছে
নর্দমার মতো এই প্রবাহ কলকাতার সমস্ত দুষিত বয়ে নিয়ে চলেছে
এর মধ্যেই আমার শরীরের মূল ভূখণ্ড ওঁ মন্ত্রে শোধিত হবে
সমস্ত পাপ সমস্ত দাহ সারা জীবনের সমস্ত বিসর্জন
কবিতার জন্য এই তুমুল সংসার ত্যাগ
বন্ধুর কাছ থেকে ফিরে আশা অথবা সেই নারী
তোমায় কেন ভালোবেসেছিলাম কেন নিজের ঠিকানা বদলে
মুখোস পরে কতদিন পথে বেরিয়েছি
সব শান্তি পাবে, স্বর্গের সেই পথ
যুধিষ্ঠির যেতে যেতে যেমন পরিত্যাগ করতে করতে চলেছেন
অনুজ ভাই পাঁচ জনের ভোক্তা নারী
অথচ একান্ত নির্ভর, আপতকালে সেই নারীও
পরিত্যাগ যোগ্য হয়ে ওঠে স্বর্গের পথে
আমি কি ফেলতে ফেলতে যাব
সব কিছু পুড়িয়ে কয়লা করে এসেছি
কলকাতার গঙ্গা অজস্র ভাইরাসে ভরে দিয়েছে নাভিকুণ্ডলী
স্বর্গের পথে এই সব ভাইরাস কি আমার সঙ্গী হবে
গোলাপজল কোথায় পাব আতর কি পরিজনরা দিয়েছিল শ্মশান যাত্রায়
পথ কি চিনতে পারব যদিও বহুজনের পায়ের ছাপে গভীর
কিন্তু আমি খুব পথ হারিয়ে ফেলি
চেনা পথেও দু'স্টপেজ পরে নামতে হয়
আমার কোন সঙ্গী কি বরাদ্দ থাকবে
ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কি বলবো

কেমন আছেন, আমি নাকি আপনারই অংশ
তবে এমন নাকাল করলেন কেন ?
আপনার অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে দু'একটি মুহূর্ত মাত্র
সবে জমে উঠছিল ভালোবাসা
মেয়ে মানুষ যখন খোলে
আপনি তার মধ্যে কথা বলে ওঠেন
পৃথিবীতে ঈশ্বর দর্শন কি পাপ
তা হলে আমায় নরকের জলন্ত লাভায়
ঝলসাতে থাকুন, বাংলাদেশের দূষিত আবহাওয়ায় যদি পারি
স্বর্গের কাছাকাছি নরকের এই পরিবেশেও
টিঁকে যাবো। ভেবেছিলাম বলবো না
কবিতা ও মেয়েমানুষ কোনটাই আমি ছাড়তে পারব না
দু' জনেই ভেতর থেকে পোড়ায় বলে
স্বর্গের পথে আমার কোনো কষ্ট হয় নি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জল বিস্তৃতি

জলবিস্তৃতি কিছুতেই কমতে চাচ্ছে না।
খরার বেড়ি পরলেও,
জলবিস্তৃতি সেই একই থাকছে।
রোদ্দুর করছে সাঁই সাঁই,
মেঘ হয়ে কমে যাচ্ছেনা।
জলবিস্তৃতি সেই একই থাকছে,
অনড় জলের ঘের কিছুতেই কমছে না।

বাসুদেব দেব

এবার খুব বৃষ্টি হবে

১
'জীবন জলসাঘর নয়, পিকনিক নয়'
প্রত্যহ দুঃখের দিকে ক্রমশ একাকী করে দিয়ে
এই কথা শিখিয়েছ তুমি
বাড়ি ঘর কিছুই হল না ঠিকঠাক
চলন্ত পথের মধ্যে দেখা শোনা কথাবার্তা, অপেক্ষা ও অন্বেষণ
বর্ষার পুকুর তুমি, গাঢ় গাঢ়তর থাকো
আমার পথের শেষে টলটলে একচোখ জল
বাস্ত ব্যবহার থেকে এই ভাবে তুলে আনো বেলা অবেলায়
২
শরীরে ঢুকেছে সেই পুরোনো বাদুড়, পোড়ো ঘরে
পাঁশুটে বেড়াল নামে সাঁঝবেলা আমার সংসারে
দেখে আমিষ টামিস সব কেমন রয়েছে ঢাকা, এক বাটি দুধ-ও,
বড় মায়া লাগে এই সব ছেড়ে যেতে. হাওয়ায় লেগেছে কবে টান
সন্তানের ঘুম মুখ, আসবাব বিছানা, প্রিয় নারী,
প্রিয় ছিল এই সব, তুমি আরো প্রিয় ছিলে, তৃষ্ণার মতন তরুণী
এই সব হবে নিরাময় ?
যতো একা হয়ে যাই, সরে যাই তোমার দিকেই
তুমি আরো সরে যাও, আমার মতন তবু কে চায় তোমাকে !
কয়েকটি জোনাকি কেউ ছেড়েছে এখানে, এই লতায় পাতায়
এ সবই আমার ছিল, আমাদের ছিল একদিন
৩
চলে যাই, যে রকম যায় সব কিছু
রাতট্রেন, বেনোজল, বিবাহবাসরে ফুল, ফেরিওলা অথবা ভিখিরি
কেবল তোমার ঐ উদাসীন মুখে মিনে করা
রয়ে যাবে অহংকার, ভাবলেশহীন তারা, গ্রামীণ প্রকৃতি
ভালোবাসবার থেকে আরো কিছু ভালো আছে না কি ?

কোনো গান, কোন ছবি, শরীর আরাম
উপহার, শব্দের আরতি ?
চলে যাই, যে রকম যায় রাত ট্রেন, বেনোজল……
আকাশে নেমেছে সেই মেঘ
যখন মানুষ চলে যায়, দৃষ্টি তার তুলে নিয়ে শস্যক্ষেত থেকে
দুপুরের টেলিফোন একা একা বেজে যায় যাক,
ভিজে হাওয়া তখন কেবল হাওয়া রয়
জীবন জলসাঘর নয়, জীবন জলসাঘর নয়

রবীন সুর

একদিন না একদিন

যদি কেউ স্বপ্নের কাছাকাছি
আমি তার ঠিকানা খুঁড়িনি।
স্বপ্নের অভ্যেস ভালো নয়—
ঘুমনষ্ট ক্লান্ত ভোরে চোখের পিচুটি বাড়ে।
চোখের পিচুটি-অক্ষমতা নিয়ে
আমি কোনোদিন কোথাও কারও
দ্বারস্থ হওয়ার পাটোয়ারি বেদনায়
বিধ্বস্ত স্মৃতির
অনেক করুণ অভিজ্ঞতার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জলাঞ্জলি।
আসলে কেউই কোনোদিন কাউকে ডাকে না—
লজ্জার বোঝাই শুধু বেড়ে বেড়ে পর্বত প্রমাণ,
হাজার বছর ফুরোলেও কাউকে বোঝা যায় না।
কেবল অপব্যয়ে হাতের পাঁচ
ভুল হিশেবের মাশুল গুণে
সকলকেই
একদিন না একদিন ফতুর হয়ে যেতে হয়।

সুজিত সরকার

কোনো কিছু নিরর্থক নয়

প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে সুন্দর ক'রে তুলতে চায়।
রাজমিস্ত্রী ইঁট ভাঙ্গছে।
কাপড় কাচার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
দূর থেকে শিশুর চীৎকার ভেসে আসছে।
রাড়ীর ভাঙ্গাচোরা অংশগুলি সারানো হচ্ছে
বাদবাকী জীবন যাতে আনন্দে কাটানো যায়।
ময়লা কাপড় সাফ করা হচ্ছে
আটপৌরে জীবনে যাতে শুভ্রতা হারিয়ে থাকে।
শিশুটি ভাষাহীন চীৎকারে দাবী করছে
তার প্রতি আরো একটু মনোযোগ, আরো একটু ভালোবাসা।
প্রতিটি মুহূর্ত নিজেকে সুন্দর ক'রে তুলতে চায়
—একথা যে জানে, সেই বোঝে,
কোনো কিছু নিরর্থক নয়।

রথীন্দ্র মজুমদার

একা দরজায়

ভিড়ের ভেতর দেখা হলো আমাদের
এই বৃষ্টির সন্ধ্যা, স্মরণ-সভায়
তোমার কি কিছু মনে পড়ে
নীরব তাকিয়ে-থাকার ভাষা
শিরায়-শিরায় গোপন রক্তের স্রোত
আমাদের অবৈধ হৃদয়
কথা ব'লে উঠতে চায়
জানিনা, তোমার শরীর
কবে ফুটে উঠেছিলো
যৌবন যায়, যৌবন

এবার তো ঝরার পালা
সভা ভেঙে গেলে পর
একে একে সবাই যায়
একা এলাম, একা, এই জীবন
এসো, আমি দাঁড়িয়ে আছি
একা দরজায়
বাইরে বড়ো অন্ধকার
এসো, চলে-যাওয়ার সময়
এই নীরব চোখের চাওয়ায়
তোমাকে শোনাই
এই বৃষ্টির ধারায়
জেগে থাকার
একা, কতকাল
কত মধ্য-রাত্রির প্রার্থনা !

রণজিৎ দেব

অনুর্বর ভূমিতে দাঁড়িয়ে

হুহু করা একটানা হাওয়া
সংগে একটা তীব্র গর্জন
এলোপাথারি আঘাত করছে
এলোপাথারি কি যেন আঘাত করছে
যখন সব স্থির যেন কাজলা দিঘীর জল
ঠিক তখন একটি নম্র কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে :
লাভ-ক্ষতির হিসেবে জীবনটা এভাবে দেখা চলে না
এমন সময় এলোপাথারি আঘাত
চোখে মুখে জলের প্রবাহ
স্থবির একটি মানুষ ভাবে
হয়তো এভাবেই একদিন এই অনুর্বরা ভূমির
কোথাও কোন সময় পলি জমতে পারে।

সুভদ্রা ভট্টাচার্য

সীমারেখা

মাটিপেষা যন্ত্র দিয়ে আমি এখন
কেবলই মাটি পিষছি,
মাঠের সারা শরীরে রক্ত জমেছে
খেয়াল করিনি,
……কাল্‌চে ছোপকে ভেবেছি
পুরনো বুঁজে যাওয়া গর্তের সীমারেখা,
ভাবিনি
রক্ত কখনও অতকালো হতে পারে
মাঠের শেষে উলঙ্গ মানুষের
উৎসবমুখর চাঁদোয়ার নীচ থেকে
পঙ্গু মানুষের বাতাস কাঁপানো গলিত চিৎকার
ভেসে আসছে,
মাঠের জমে থাকা রক্তকে তারাই প্লাবনে ডাকছে
কখনও কখনও মৃতদেহের সন্ধানে
আদিমদিনের মানুষ শিকারী মানুষের
কৌপীনপরা মূর্তি দেখা যাচ্ছে
শুধুই খুঁজছে
কয়েকটা গলিত মৃতদেহকে
আর আমি সমস্তদিনটা ধরে
পৃথিবীকে ভুলে থাকার চেষ্টায়
কেবল মাটিই খুঁড়ে যাচ্ছি

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সেই এক দিন তুমি

সেই একদিন তুমি গল্প বলতে ভূতের,
আর সন্ধ্যে হলেই দেওয়ালে তখন ছায়া কাঁপতো ;
ছায়া কেঁপে কেঁপে এক একটা ভূত তখন যেন হাত বাড়াতো
আর তোমার আঁচল ধরে সেজন্যে তাড়াতাড়ি
চোখে ঘুম জড়িয়ে নিতাম।
দেওয়ালে এখনও ছায়া কেঁপে ওঠে,
ঘুম এখন আর দু'চোখ জড়ায় না, বরং
দু' চোখের পাতা দৃষ্টি মেলে ধরে, ক্রমশ
একের পর এক বিনিদ্র রাত্রি পার হয়ে যায়।
এ সমস্তও ভূতের কাণ্ড। রক্তমাংসের ছায়া
এখনও দেওয়ালে দেওয়ালে, ঘরে বাইরে, মুখোমুখি
শুধু ছায়া ফেলে ফেলে ঘুম কেড়ে নেয় !
ঘুম পাড়ানিয়া গান মায়েরা ভুলে গেছেন
ঘুম তাড়ানিয়া ছায়া কখনও কখনও
আপন ছায়ার সঙ্গে
লড়াই করে ; লড়াই করে বাঁচতে চায় ॥

কমলেন্দু সরকার

আত্মচরিত : তেত্রিশ

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে হেঁটেছি বহুদিন
ভালবাসায় পা ডুবিয়ে অথৈ নীল জলে
পেয়েছি শৈশব উল্লাস।
ঝুম দুপুরে কলমিপানায় হাতের মুঠোয়
ধরা ছিল জলফড়িং-এর ঘুনসুটি
ভাতের গন্ধে মুখ লুকিয়ে মহাজনে নৌকো ধরে

পালিয়ে যেতাম—
সুদূর হলুদ সরষে খেতে স্বপ্ন রঙিন নকশী কাঁথায়
দিন কাটত পাখির ডানার শব্দ শুনে।
ভেসে যেত একঝুড়ি মেঘ আনন্দ-আলস্যে
চিঠি আসত পাতা ঝরার খবর নিয়ে।
জঙ্গল নদী পাহাড় ভাল বেসেছে আহ্লাদী অত্যাচারে।
এখন শৈশব-উল্লাস ভেঙ্গে যায় অভিমানে
আচমকা উথাল-পাথাল সমুদ্র শব্দে ঘুম-সুখ
একত্রিশে নারীর মুখের ওপর পড়ে থাকে নীল ঘাম অনন্ত-ঐশ্বর্যে

আরতি সরকার

খিদে

সময়ের চার চাকা যদি কারো খাদ্যটুকু
সময়ে না এনে দিয়ে যায়
কি হয় না খাওয়া হলে
এই সব না খাওয়া দিন রাজা জানে
তবু রাজা অন্য কোন পথ মানে না
সব্বাই যে পথে চলে
সেও সেই পথ চেয়ে
সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্ক কষে
মনযোগ দিয়ে
আমার তা ভাল লাগে না
যে রাজা সে রাজাই
পথেরও সে রাজারও সে
তবু রাজা অন্য কোন পথ মানে না॥

অজিত বাইরী

রাখতে পারো নি

ভালোবাসাকে চিনতে পারো নি ;
তাই মাঝপথে এসে ফিরে গেছে।
ভালোবাসাকে পেয়ে রাখতে পারো নি ;
তাই কাছে এসে ফিরে গেছে।
ভালোবাসাও চায় ভালোবাসা—
সুখ চায়, স্বাচ্ছন্দ্য চায়।
দারিদ্র্যের পিঁড়িতে ব'সে দুঃখ-বিলাস
তার পছন্দ নয়, পছন্দ নয়
সুখের বাগানে অকারণ কাঁটার ঈর্ষা।
ভালোবাসা মাঝপথে এসে ফিরে গেছে
তুমি চিনেও চিনতে পারো নি।
ভালোবাসা থাকবে বলে এসেছিলো,
তুমি পেয়েও রাখতে পারো নি।

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্বৃত্ত

যে কুর্ণিশে নুয়ে আছে
যে রেখেছে ভুল পায়ে মাথা
তাকে চিনে রাখো
তার বিবেকবিহীন দেহে
রক্তাল্পতা পেয়ে বসে
মজ্জা কুরে খায় পাপ বোধ
মেরুদণ্ডে জমে যায়
গ্লানির পরত

তাকে চিনে রাখো
তারও গায়ে ঝুলে থাকে
ভব্য পিরান
আমাদেরই পাশে বসে
খুঁটে খায় চা আর বিস্কুট
রোজকার মিছিলে সে
আমাদের সাথে তার শরীর মেশায়
তাকে চিনে রাখো
কোন দস্যু বা দুর্বৃত্তের চেয়ে
আরো বড় অপরাধী
অকারণে অসম্মানে
অস্থানেসে নিজেকে নোয়ায়

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ডাক

কে যেন ডাকল খুব সকালে। অন্যমনস্ক
আমি বললুম, 'যাই'।'
কে যেন ডাকল বেলা দশটায়। রূপমুগ্ধ
আমি বললুল, 'যাই।'
কে যেন ডাকল দুপুরে। ঝিমধরা
আমি বললুম, 'যাই।'
কে যেন বানাল পুতুল। পছন্দমাফিক
একটাকে আমি পরিয়ে দিলুম আমার পোষাক,
অন্যটাকে আমার স্ত্রীর।
একটা ঘুড়ি ভো-কাট্টা হয়ে আকাশে
ঘুরতে লাগল দিন ভর।
সন্ধ্যায় আবার সেই ডাক, 'অবনীশ!'
আমি বললুম, 'যাই।'

সুশীল পাঁজা

একটি কবিতা

তুমি কাছে এলে সুখদীপের গল্প হয়
মেঘের ঘর-বাড়ি নেমে আসে সবুজ উঠোনে
তুমি কাছে এলে দারুণ বর্ষা ঝরে
হলুদ পাখির ডানায় ;
আর সারাদিন অমল সুষমা ভাসে
শান্ত ফাল্গুনের বাতাসে……
এইসব স্মৃতির ভিতর জ্যোৎস্নায় জাগে
পল্লবিত নদীর স্রোত ;
গাছের ছায়ায় ডাকে অরুণ পাখি
শব্দের সহজ বর্ণমালার গান
ঝরে পড়ে গাছের ঢেউয়ে
তুমি কাছে এলে নীল সমুদ্রে ভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্না ঢাকে
সারাটা শরীরে……

বাসব দাশগুপ্ত

দিন যে রকম

ছিল দীঘি আর কম্পমান গাছের ছায়া
ছিল ঋজু পথ অথবা নিস্তব্ধ জলরাশি
ছিল ঘনপ্রেম আর আজীবন চেনা কারাগার
এইভাবে দিন খুব চেনা সময়ের নিঃশব্দ ছলনা
এইভাবে আলো জ্বলে দূর জাহাজ ঘাটায় প্রতিদিন রাতে।
এইভাবে তুমি পারমিতা বুকের গভীরে রক্ত নিয়ে খেলো।
ছিল প্রেম অথবা নদী অম্লান
ছিল প্রেম অথবা তুমি পারমিতা
ছিল ভালবাসাময় দিন অথবা তুমি পারমিতা।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঁচে থাকতে

বেঁচে থাকবো বলে আগামীদিনের জন্যে কিছু কথা রেখে যাচ্ছি
কোন কিছুই চাই না
চাই না কোন ভিন্ন আশ্রয়
পরিধি ও সীমায় আত্মকথনের ভঙ্গিটি রাখতে চাই
মুক্তদিনের দিকে চেয়ে ভাবি
পায়ের মাটি কত আলগা
কত বিস্মৃতি লুকিয়ে আছে হাসনুহানায়
চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অবেলা কতো দুঃখদিনের
স্মৃতি মনে পড়ায়
চোখ হাত পা এবং গলার স্বর—
ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে উদাসীন জীবনে
মানুষের বিষয়ে আর কিছু ভাবতে পারি না
কোন গদ্যভাষা নেই আমাদের
মাথার ওপরে দিনের সূর্য, সন্ধ্যার আকাশে স্বাতী নক্ষত্র
তাদের বলি তোমরা কাছে এসো
থাকো কাছে, আগামীদিনে তবু তোমরাই মনে রাখবে।

বৃন্দাবন দাস

মানুষ

একটা মানুষ
আর একটার জন্যে পাথর ঠেলছে
একটা মানুষ উঠে যাচ্ছে
আর একটার ঘাড়ে পা রেখে
একটা মানুষ হাঁ মুখে দেখছে আর
হাততালি দিচ্ছে

সুব্রত সরকার

আশীর দশকে

তোমাদের অন্ধ গলি, সাইকেল রিকশার হর্ণ বাঁচিয়ে
সন্তর্পণে ঢুকে পড়ি, এদিকে জানলায় পর্দা উড়ছে
মৃদু মৃদু, দুর্দান্ত গানের মাষ্টার হারমনিয়াম ঠেলে
চুমু খাচ্ছে কেয়ার কণ্ঠে, কলকাতা টেলিফোনস্
তোমাদের আরও পাতালে নিয়ে যাবে, কি মজা—
আর নরক, নরক রাস্তায়, ট্রামে, কোথায়
যে নয়, বাতাশে গাঁজার ফিকে গন্ধ, লাল
সত্তরের দুঃস্বপ্নের দিন তবে শেষ হয়ে গেলো ?
আবার নির্বাচন, আশীর দশকে দেখি শান্ত শান্ত
ছেলেরা পার্টি করে রৌদ্রের মত স্বাভাবিক
চাকরীও পায়, মেয়েরা রেজিষ্ট্রী পূর্ণ হলে বিকশিত
হতে জানে অসম্ভব, অন্ধের মত এও স্বাভাবিক, সত্য
কলোনীর বাঙালীদের কাছে, জানি জানি……

অশোক দত্ত চৌধুরী

সেই বাড়ির ভিতর

কিছু লিখবার জন্য যখনই ব'সে থাকি
চক্রবেড়িয়ার বাড়ি এসে পড়ে।
টানা বারান্দার কোণে একদিন নীল আলো ঝুঁকে পড়েছিলো।
আমরা কখন ছেড়ে এসেছি বারান্দা, সেইসব আলো ?
আজ মনে পড়ে, সেই বাড়ির ভিতর ছিলো
আমার নিজস্ব হ'য়ে-ওঠা আর এক
মেঘচিহ্নহীন বিকেলের আলো।

দ্বিজেন আচার্য

হে আকাশ

বড় বেশী নির্জনতা খুঁজে নিতে হে আকাশ তোমাকে
ঢেকেছি দুহাতে
যন্ত্রণায় মেঘ হয়ে—বৃষ্টি হয়ে, তুমি এলে
বুকের খরায়।
নিবদ্ধ স্বপ্নের মধ্যে কোনদিন ফোটেনি গোলাপ
তবুও গোলাপের আর্তনাদে মধ্যরাতে
ঘুম ভেঙে যায় ;
এত যে স্মৃতি ও সুখে প্রতিদিন সহবাস করি
সহমরণের মত দুঃখ চিতার সমিধ হয়ে জ্বলে
জ্বলে ? না কি আমাকে জ্বালায় ?
বিবর্ণ স্মৃতির কাছে শোকতপ্ত এ-হৃদয়
কত আর দেব বিসর্জন ?
কত আর মৃত্যু হয়ে—হিমেল মৃত্যুকে
স্পর্শ দেব—চিতার আগুনে ?
বুকের গভীরে কত আর নির্জনতা, কত খর মেঘ
শৈত্যময় আক্ষুব্ধ সংগীত বয়ে যার, হে আকাশ
বলে যাও—

সত্য বিশ্বাস

কবিতায় জীবন চেয়েছো

ভরা কোটালের বান ভেঙে গেছে কামান গোলায়
তবু তারই রক্ত আজো বয়ে যায় ধমনীতে তোমার, ভাবিনি।
কবিতায় জীবন চেয়েছে, নগ্ন নিখাদ জীবন—
জীবনে জীবন যোগ করা ?

শুধু তীব্র দেহগন্ধ, নারীর নাভির পাশে
ভ্রমরের মতো ওড়াউড়ি
কিম্বা
শংখচূড় মিলনের ঘন নিঃশ্বাসের গাঢ় শব্দে
স্পন্দমান জীবন কণিকা ? গোষ্পদে সমুদ্র যতটুকু ?
নিতান্ত গোষ্পদে নয়, সমুদ্র চেয়েছি আমি
সমুদ্রের নিজস্ব আঁধারে ; কবিতায়
তাকে চাই বৈশাখের খর সূর্যে পান্থ পাদপের মতো
প্রত্যহের দাবদাহে পিপাসা জুড়ানো ঠাণ্ডা নীল জলের সঞ্চয়
কিম্বা
কোপাই নদীর তীরে ভুবন ডাঙায় সূর্যোদয়।
ব্যবধানের বহতা নদী মাঝখানে বয়ে যায় যাক নিরন্তর
সে নদীর দুই তীর ধরে যে যার পতাকা ও কম্পাস হাতে নিয়ে
আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে হেঁটে ধ্রুবতারাটার তালাশ চালিয়ে যাব
আমরণ !

রঞ্জন ভাদুড়ী

আবার আসুন ফিরে

বচনসিদ্ধ মহর্ষিগণ কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন,
আর কি তাঁরা হবেন না ছাই দগ্ধ দেশে আবির্ভূত ?
কোথায় গেলেন দুর্বাসা আর বিশ্বামিত্র গাধির সুত ?
কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন ?
কোথায় গেলেন জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, বালখিল্য মুনি ?
এখন শুধু পুরাণকথায় অগ্নিবিহীন যজ্ঞধুনি।
জাল-ভেজালে দেশ ভরেছে, পাপিষ্ঠরা পুণ্য ফলায়,
রক্ষকে আর ভক্ষকে আজ ভাব হয়েছে গলায়-গলায়।

বচনসিদ্ধ মহর্ষিগণ আবার যদি আসেন ফিরে
তাঁদের অভিশাপের রোষে আসল হবে নকল হীরে।

বিজয়কুমার দত্ত

ধ্বনি

মনে পড়ে। মনে পড়ে বলেই হয়তো
ভুলতে চেষ্টা করি, তবু বারবার
মনে পড়ে যায়—একি আলো—অন্ধকার
অকারণ ছায়ার বিস্তার
বুকের ভিতরে জ্বালা আনে একবার
অন্যবার সুখ-দুঃখ একাকার করে দিয়ে যায়।
স্মৃতিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কেউ কি নন্দিত
হতে পারে আমরণ ? যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক
মমির শরীরটুকু কাঁচের শো-কেসে
ঢেকে রাখতে দিন যায় রাত্রি যায় উপচীয়মান
নষ্ট শ্রমে, অনাদরে অলীক আঁধারে
তবু কেন ভোলা যায় না অশ্রুরেখাময়
নাতিদীর্ঘ কাহিনীর উত্থান-পতন ?
শানাই বাজানো ভোরে কোথাও মন্ত্রের
অফুরান নিখাদ সুরের শান্ত কারুকাজ নেই
তবু যেন কানে এসে বাঁশীর ধ্বনির মত বাজে
তোমার কণ্ঠের জাদু সারাদিন কাজে ও অকাজে।

জয়ন্ত সুকুল

আড়াল

আড়াল বলে আছে কি আজ
কিবা আছে গোপন ?
গভীর জলের মাছের মতন শুধু
সব মানুষের চলন !
বন্ধ ঘরে তালা চাবি
অন্ধ মনে কিসের এত আড়াল !

চারদিকে আজ পাথুরে বাধন
নেইকো কিছুর টান
সবাই থাকে নিজের মত
যেন সুখ আমোদের প্রাণ।
এই যে ছাড়া ছাড়ি
এখানে নেই শান্তি'
অবিশ্বাসে হাঁটছে মানুষ
শতেক যে তার ভ্রান্তি।
আড়াল হলো হিংসা
কিম্বা আত্মসুখ
সুখ থাকেনা গোপন
আড়াল হলো অসুখ

শোভন মহাপাত্র

নিশীথের গানে

মনে নেই, ছিন্ন হয়ে গেছে কবে, কোন অচেনায়
রঙন সুদূরে ছিল, নদীর হাওয়ায়-
আভাসে কুসুম ছিল, ছিল সত্য ডানামুখী রাত্রির শেষে
ছিল গান, কুহকপাখির গলা
ছিন্ন হয়ে গেছে সুর, নিশীথের গান
কোথায় বনশ্রী গ্রাম কমলসুরের টুঁহুঁ পাখি
কোথায় গমের নীল আকাশ-উদাসী
দেখিনি এখনো সেই মেঘ
সেই কমলা বৃষ্টির পালক—
কোথায় হলদীর সিঁথি, কোথা শ্যামসখী।
প্রথম শরতে আজ দেখি ধূসর কণিকা
সত্য আজ দূর দেশে গোপন প্রবাসে
পুরনো সখীর রূপে নিশীথের গানে।

প্রদোষ দত্ত

নিষ্পাপ পৃথিবী কন্যার

তোমার আমার প্রথম দিনের
রঙ মেশানো সেই সুর,
প্রগাঢ়তায় রাখালিয়ার বাঁশি বেজে যায়……
সেদিন মনে পড়ে?
গোলাপে ভরে গেছে তোমার বুকের বাগান,
গন্ধ নেবো বলে গভীরে গোপনে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছি সোহাগে সোহাগে।
তারপর কখন সবকিছু জানাজানি।
আমাদের চাঁদের ভুবন থেকে দেখি—
দূর দূরের উতরোল পৃথিবীকন্যাকে।
নিষ্পাপ পৃথিবীকন্যার বিষাদ নেই কোথাও,
তবুও হাজারো অন্যায় ঘর বাঁধে এখানে।

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

পথ

অর্থহীন ঘুমের ভিতর থেকে আমরা ছিনিয়ে আনব সুস্থ সকাল
এই ছিল প্রতিশ্রুতি অথবা শপথ
তারপর, সমস্ত শহর ঘিরে ফেলে
মুখ উঁচু করে উত্তেজক থু থু ছেটালাম
ধারালো অস্ত্রের মুখে শোধ করলাম রক্তের ঋণ
এখন দু'হাত দিয়ে থু থু-র স্রোত ঠেলতে ঠেলতে
দেখছি বাইরে যাবার কোন পথ নেই
আমাদের চোখ নেই মুণ্ডহীন নির্বোধ শরীরে

সৈয়দ কওসর জামাল

শিল্পের দায়

বিপদ সংবাদবাহী ঘণ্টাগুলি কতদিন থেকে বেজেই যাচ্ছে
দুর্গের গায়ে ভাঙা গম্বুজ ঠেস দিয়ে বসে আছে একভাবে, ক্যামেরার চোখে
সিঁড়ি নেই, খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু আমাদের ছায়া,
সম্ভ্রমটুকু—আর কিছু অবশিষ্ট নেই
নতুন বর্ণলিপি এবার শিখতে হবে আমাদের
আর্কাইভ থেকে মানুষের পুরণো পুঁথিপত্র সব এবার মেলে ধরবো তোমাদের কাছে
তামার জটিল মুদ্রার সঙ্গে কথা হবে আজ
ছাই ও এ্যাসিডের বুকে ঢেলে দেবো অভিজ্ঞতার নৈপুণ্য
দহনে কঠিন হোক স্নায়ু, লক্ষ্যভেদী হোক চোখ
নতুন ঝাড় ঝাপটা এসে এবার লাগুক শিল্পের গায়ে
কোন্ নব্যরীতি বয়ে নিয়ে যাবে আমাদের পাপ ও অক্ষমতার ভার ?

কার্তিক বৈরাগী

স্মৃতি

আজ থেকে আমার তেমন করে
ভাবার আর কেউ নেই
সে হারিয়ে গিয়েছে এই মাত্র
অমোঘ ঘুমে শুয়ে আজ আমার প্রেমিক
কতো স্মৃতি আধো আধো ছবি হয়ে ভাসছে
বুকের হাড়গুলি সব যেন খশে পড়ছে
ভাবার ও কিছু নাই ॥

নৃসিংহ মুরারি দে

নির্জন অরণ্য ছায়া

সেই শীত সেই রোদ সেই সাগর
সারা শরীরে উপছে পড়া সবুজ যন্ত্রণা
উল্টোদিকে ঘড়ির কাঁটার অবিরাম দৌড়
অশরীরি দেহে দোলা আর দোলা
অবাধ্য নিমজ্জন আর কথপ কথন
সব কিছু ভুলে গিয়ে—বিদিশার বুক
তুমি শুধু তুমি আর তুমি
এক বুক অন্ধকারে পথ খোঁজা
যে পথ পাখীদেরও অজানা
সেই হারিয়ে যাওয়া
সেই নির্জন অরণ্য ছায়া
সেই বুকে করে এখন ও

দেবাশিস চন্দ

জার্গাল

কি'ই বা দেখার আছে এত
নিজেকে ছাড়িয়ে নিজেকেই দেখা কেবল,
মুক্ত নাভিতটে নাচে ত্রস্ত জীবন,
আত্মগোপনে আছে অনুপম স্বাদ।
ক্রমশ গভীর থেকে গভীরে, নিজেরই
নাভীরে গিয়ে নিজেকেই দেখা বারবার,
শায়িত জীবনের দোরগড়ায় পড়ে থাকে
আমাদের সমস্ত ঝড়, জল. ক্লীবতা।

শিবময় দাশগুপ্ত

এই ভাবে একা একা

শৈবাল দীঘির জলে ভেসে ওঠে একজোড়া শব,
ওরা দুই বালক-বালিকা। আবাল্যের সাথী ছিল—
নাকি ছিল গোপল প্রণয়! শাসনে বিচ্ছিন্ন হবে
এই জেনে, প্রেমের বা জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম
ওরাই দেখাল। শৈবাল দীঘির জল এ সমস্ত
ভ্রূক্ষেপ করে না। জলের পাপড়িতে রোজ পদ্ম ফোটে,
ভ্রমরের শাশ্বত যাতায়াত হয়—পদ্মফুল মধু দেয়,
সহ্য করে হুলের যন্ত্রণা। কৃশ জীবনের কাছে
এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। লক্ষ লক্ষ হা-হা কারে
অন্ধকারে একা পড়ে থাকে।…তবু একা যেতে হবে,
যেতে তো হবেই। —এইভাবে একা একা আর কত কাল!

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

বয়স্কতা

প্রকৃত চেষ্টাটি হলো বিকেলের শেষ দিকে, যেখানে বিকেল
ঈষৎ সহজ হয়ে নেমে এলো স্তব্ধ কেশে, এই শেষবার
এমনই নমিত ভঙ্গী, একটু প্রাচীন আর প্রণামের মতো পরায়ণ
ছিল বয়েসের দিকে, যেখানে কাঁচের ঘ্রাণে হারানো শাওয়ার
ধ্বনিলোভ নিয়ে আসে,—গ্রাহ্য অতিথির মতো হেসে
ফেরার প্রস্তাবটিকে ফেলে আসে উচ্চারণ যেখানে নিভেছে একবার,
সেই অতিক্রত পথ আর কি সংঘর্ষে যাবে? না কি, আরও হেসে
চিবুক ভিজিয়ে তীব্র ধুয়ে দেবে বয়েসের লেশ।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ও কার বেদনা

কাঁটাতারে জড়িয়ে রয়েছে নীল শাড়ির টুকরো
আর নুনছাল
ও কাদের কাঁটাতার ও কার বেদনা
ছায়া আটকাতে চেয়েছিল কারা আর
কারা চেয়েছিল চলে যেতে
সাক্ষী কাঁটাতার
সে জানে লক্ষনের অধিকার
কতটা আকাশ ছুঁয়ে আছে
কতটা আকাশে মুছে গেছে
একটু ওপাশে বুঝি বেদনার পাথরটি জানে
সে রহস্য……বাদামী শূন্যতা

রমেন আচার্য

স্বপ্ন

মৃত তারাদের বিগত জ্যোৎস্না যেমন আকাশে আছে,
তেমনি স্বপ্ন নির্যাস দেয় জীবনের ফুল গাছে।
এরকম আলো ঘাম ভেবে কেউ মুছে নেয় বার বার,
যেন স্বপ্নের বুকে পা রেখেছে ক্ষুধা। দারুণ অন্ধকার
যেন ভারী মেঘ চোখে বুকে নামে। নিঃশ্বাসে করে ভর
ক্রমশঃ বুকের গভীরে নামছে। তখন স্বপ্ন তার শুষে নেয় জ্বর,
নির্যাস হয় জলপটি, আর ফোটায় দোপাটি স্বপ্নের ফুল গাছে,
অসম যুদ্ধে যোদ্ধার পাশে স্বপ্ন ছাড়া কে আছে!

শ্যামলবরণ সাহা

ফুলচোর

পাপ বন্দী প্রেমিকের ঘরে জোছনার ফুল
আমার ভালো লাগে না,
তবু বারবার প্রিয় মুখে গয়না আঁধার এসে
আমাকে শিখিয়েছে—
প্রেমিকের কিছু মুদ্রাদোষের মতো নিজস্ব পাপ থাকা ভালো।
প্রকৃত পাপের কোনো রঙ নেই,
একজন ফুলচোরের দুঃখে কাল সারারাত
পৃথিবীর সব গাছ কেঁদেছিল !……

জহর সেন মজুমদার

সর্বনাশ ও প্রেম

সমস্ত পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে আন্তরিক প্রেম, আহা,
মধু নীল জলে বেঁচে আছি, কই, রূপকথা কই ?
যেন দোর খুলে যাবে, যেন মায়ার চুম্বন এসে
ছুঁয়ে দেবে সকল মানুষের পুড়ে যাওয়া ঠোঁট ;
ঋতুর সঙ্গে এক ঋষিকুমারের খেলা দেখে
হর্ষমুখরিত হয় এই দিনের ভূমিকা
আমি বেঁচে থাকার প্রণালীতে চোখ রাখি
আমি বাঁচিয়ে রাখার প্রণালীতে মুখ রাখি
সমস্ত পৃথিবীর দিকে ছুটে যাচ্ছে জল ও জলের ছন্দ
গান গাও, উর্বর হয়ে ওঠো তোমরা বীজ চলাচলে।
আমাকে পারলে রেখো পাশে ; আমাকে পারলে
বলে দিও কোথায় গেলে অতিক্রম করা যাবে
আগুনের সর্বনাশ—

মলয় সিংহ

অস্ত্রের গৌরব

রক্তের ভেতর থেকে ছুটে গ্যাছে আলো আর উষ্ণ আহ্বান
বোধ হয় তুমি এলে—
না। একরাশ দমকা বাতাসে ভুল হলো, বিভ্রান্ত কেড়ে নিলো আকাশ !
তখন না ঘুম, না জাগরণ ; শরের পাতার মতো তীক্ষ্ণ দেহে
ঘর খান খান হলো ; হাঃ পাতক, এ তুমি কি করলে ?
পরিত্রাণহীন দুর্গে কাকে রেখে
কাকে অনন্ত নিসর্গের লোভে হারাতে চলেছো !
এখনও সময় আছে মেঘ, কিছু বৃষ্টি কিছু বজ্র ফেলে
টানটান শায়িত শওয়ারকে তুলে ফ্যালো রণে ;
এখন না ঘুম, না জাগরণ ; শুধু অস্ত্রের গৌরব নিয়ে ঘোরাফেরা।

প্রমোদ বসু

বিমূর্ত

বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, অলক্ষ্যে, সাবধান,
বাঘের মতো হিংস্রটে বিদ্যুৎ।
বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল পর্বত সমান,
কর্ত্তব্য বিমুখ।
যে দিকে চাই হাড় কাঁপানো উদ্বেগে অস্থির
অন্ধকারের লুকোনো গৌরব,
বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল তেলরঙা এক শরীর,
ঘড়ির মতো বাজছে অনুভব।
বাজছে, কেবল শূন্যে দুলে বাজে—
হৃৎপুণ্ডের দরবারী, গান্ধার,
এখন আলোয় এদিক যদি সাজে,
অন্যদিকে ঘুটঘুটে আন্ধার।

অজয় সেন

ফেলে আসা দিন

গূঢ় রহস্যময়তা খান্ খান্ করার জন্য হাতে হাত
ধরেছিলাম আমরা,
স্বপ্নের মধ্যেও যে বিষণ্ণতা, ভুল বোঝাবুঝি থাকে
তা কি জানতাম ?
জেনেছিলাম গ্রামাফোন ডিস্ক্, ফ্যারেক্স বেবীর
আহ্লাদীপনা-অথচ
এই রহস্য দেশে নেমে দেখলাম—বড় বেশি কোলাহল
বড় বেশি পিছু টান ফেলে আসা দিনের জন্যে
এক শান্ত, নির্বাক ঘণ্টা বাঁধা আছে কোথাও
কে আমাদের বোঝাবে দড়ি টানার কৌশল—যা
আমাদের স্থিতু করবে
সৃষ্টি ও ধ্বংসের পাশে নিবিড় এক জীবনের দিকে ॥

অমিতাভ সেনগুপ্ত

স্মৃতি-বিস্মৃতি

পুরোনো খিলান ও গম্বুজ ছেড়ে
এক ঝাঁক পায়রার উড়ে যাওয়ার শব্দ,
আমার মনে আছে।
ওই শব্দ এ জীবনে আর কখনো শোনা গেলে
তাদের গ্রীবার চিত্রকর্ম মনে পড়ে যাবে।
কেননা শব্দ মানেই সাঁকো
সেই স্মৃতির সঙ্গে, বেঁচে থাকার, শব্দ সেতুবন্ধ।

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(প্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে)

সম্রাট

মানুষটার হাতে ছিল তামাম পশ্চিমবঙ্গ
মুখগুঁজে ভদ্রলোক তবু কুড়িয়ে চলছিলেন
লাগাতার এক অধ্যুষিত গঞ্জের নদীতীরে
হারিয়ে হাওয়া টুকরো টুকরো কাঁচের চুড়ির শব্দ।
সাগর তোমাকে সহ্য করেছে।
রমণী করেছে সওদাগর।
শব্দ দুমড়ে মুচড়ে যন্ত্রণার অর্গান বাজাও তুমি।
অথচ দেখেও দেখনা ময়ূর মেঘের নীচে
তোমারই ইজারা নেওয়া ভুবন ভাঙার মাঠে একাকী যুবক
ভর দুপুর, টে-টে তোমার নীল চিঠি বিলি করে আজো।

কার্তিক মোদক

দৌবারিক

ভয়ঙ্কর দুঃখে প্রতিবাদ জেগে ওঠে, গাছের শরীরে
লতা পাতা
ছায়া কীট প্রতঙ্গ ও মথ
গার্হস্থ্য আশ্রমে
দেবতার পাঠ নেয়
শিল্প যুদ্ধে পরাস্ত সে দৌবারিক
তবু বারংবার আশ্রয়
খোঁজে
দুরন্ত বাতাসে
মেঘের ভেতর থেকে পরমাণু
ঝরে পড়ে সমুদ্র মাথায়

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

ছবি ও বোধ

ছবি

অসার আল ভেঙ্গে ছোটা বাঁকা পথে সড়কের দিকে
সহজসরল নয়, মোড়ে মোড়ে শতদল ঢেউ উবুশোয়া মাটির আঘ্রাণে
কারা যেন সমবেত বাঁক থেকে বাঁকের গভীরে স্তব্ধশোকে
এক দল ছিঁড়ে নিলে নিকষ কি হবে সব ছবি ?

বোধ

বোধ শুধু বোধ ধ'রে রাখে আমাকে এই গুমোট আকাশে
ঝড় নেই, পাতা তবু ঝরে, দীর্ঘশ্বাসে ভারী বাতাস গুমরে অভিমানী
আমি দেখি ও দেখি না নদীতে পাপ আছে কি-না
মোহনালক্ষ্যে স্থির বোধ, শুধু বোধ ধ'রে রাখে।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

আনন্দে থাকো মন

আনন্দে থাকো মন, আনন্দে থাকো।
আর স্থির হ'য়ে বোসো।
আহা, অনেক মেখেছো ধুলো,
সেই দিনগুলো
ভেবে ভেবে, ভেবে ভেবে
নিজেকে পাথর কোরো না
এসো, আজ এ-অন্ধকারে
আলোর স্বপ্ন দেখি, গান গাই।

প্রশান্ত রায়

"গুরু কৃপাহি কেবলম্"

ক্যাশ অফিসের কুণ্ড মশাই লোকটি বড় খাঁটি,
হাত বাড়িয়ে ছোঁন না টাকা, ভাবেন, টাকা মাটি !
কাজ করে যান মুখটি বুঁজে
কাটান না দিন ফাইল খুঁজে
ঠিক টাইমে হাজিরা দেন তিলক ফোঁটা কাটি।
"বিল" বাবুবে সবাই ভাবে – নিরেট হাবা গোবা,
টেবিলে তাঁর গুরুর ছবি পাচ্ছে পটে শোভা।
ঘুষের কথা ঢুকলে কানে
তাকান ঘুরে গুরুর পানে
দুই কানে দুই আঙ্গুল দিয়ে সাজেন কালা-বোবা !
ঘোর কলিতে ভক্তি এমন আছে বা কার পেটে
ঘুষ দাতারা এলেই তিনি পড়েন ক্রোধে ফেটে :
'বেরিয়ে যান সামনে থেকে
গুরুর পায়ে প্রণাম রেখে।'
ফটোর গায়ে ছুঁইয়ে মাথা 'পার্টি' পড়ে কেটে !
এক টেবিলে তিরিশ বছর করেন তিনি কার্য
লিফ্‌ট, প্রমোশন, ডেপুটেশন, হ'ল না তাঁর ধার্য
নেই অনুযোগ, নেই অভিমান
ভক্তি সহ কাজ করে যান
সঙ্গী সাথীর টিট্‌কারী সব করিয়া অগ্রাহ্য !
তিনটি দশক চাকরী করে নিলেন অবসর,
সবাই জানে ঘরের চালে জোটেনি তাঁর খড়
কি জানি হায় চলবে কিসে
ঋণের বোঝা ফেলবে পিষে
শেষ বয়সে কি কাজ করে খাবেন অতঃপর ?
গ্র্যাচুইটি আর P. F. জমা ছ' সাত হাজার পান
সে টাকাটাও ফ্লাড রিলিফে করে দিলেন দান।

কলিগ্‌রা কয়ঃ 'আস্ত গাধা !'
তুল্‌ল তারা মস্ত চাঁদা
বিদায় ভোজে মুর্গী গিলে বল্‌ল, 'মহাপ্রাণ !'
ঐ টেবিলে বসবে না কেউ, সবাই দৃঢ় মতি,
বসলে সেথা জীবনে আর হবেনা উন্নতি ;
তার চে' তুলে টেবিলটাকে
পাঠানো হোক কুণ্ডুদাকে
ইউনিয়নের জঙ্গী নেতা দিলেন সম্মতি।
টেম্পো চেপে টেবিল গেল কুণ্ডু-নিকেতন,
গিন্নিকে ভুরু টেবিল গুরু বলছে, "বাছাধন,
ক্যাশ টেবিলে আমায় ফেলি
হতচ্ছাড়া কোথায় গেলি
বিট্রে করে বুড়ো কি তোর শুক্‌নো ভোলা মন !"
সহসা এক বিজয় বীণা বাজিল অন্তরে !
কি শিহরণ, জীবন তরী ভিড়ল ডাঙ্গা-চরে !
কুণ্ডু বুড়া শাবল আনি
টেবিলটাকে ফেলল ভাঙ্গি,
এ রাতে তার দুয়ারগুলি ভাঙ্গলো বুঝি ঝড়ে !
যৌবনে এক গুরুর কাছে নিয়েছিলেন দীক্ষা—
ভবের হাটে হাঁটার রীতি দিলেন তিনি শিক্ষা।
অফিসে তাই টেবিল কেটে
গুরুর ফটো সেথায় সেঁটে
সারা জীবন করে গেলেন গুরুর কৃপা ভিক্ষা।
ফটোর নীচে তক্তাতে এক কাটিয়া ঘুল-ঘুলি
কুণ্ডু মশাই পেতেছিলেন প্রকাণ্ড এক ঝুলি
ত্রিশ বছরে ভাগ্যক্রমে
গুরুর কৃপা উটল জমে
হ্যাঁচ্‌কা-টানে বস্তাটাকে ফেলেন আজি খুলি।
বস্তা ঝেড়ে বের হল আজ লক্ষ তিনেক থাম,
মুখ আঁটা সব থাম গোছাতে অঙ্গে ঝরে ঘাম ;
দিলেন জমা থাম গুনিয়া
ফিক্সড্ ডিপোজিট-ব্যাঙ্কে নিয়া ;
মুক্ত হয়ে ভক্ত হ'ল রওনা কাশী ধাম।

॥ খিদে ॥

[শ্রুতিনাটক]

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সিস্টার···সিস্টার। এই যে···শুনছেন। শুনুন না ভাই। অমন রাগ করছেন কেন ? আমি তো আজই চলে যাবো। আর কোনদিনই আপনাকে জ্বালাতন করতে আসব না। একি ! সত্যিই চলে গেল দেখছি।

যাক্‌গে···আজ আর কারোর উপর অভিমান করব না। আজই তো আমি চলে যাচ্ছি। দেখতে দেখতে দীর্ঘ পাঁচটা মাস এই ছাদের তলায় কাটিয়ে দিলাম। আর আজই তার শেষ দিন। আজ আমায় চলে যেতে হবে। আজ আমার ছুটি।

আসল কথাটাই তো এতক্ষণ বলা হয়নি। কেন এসেছিলাম এখানে। হাসপাতালে কী আর কেউ সাধ করে আসে ? ওষুধ নেই, বিষুধ নেই, সেবা নেই, শুশ্রূষা নেই, বেড নেই। তবু আমাদের অনেককেই এখানে আসতেই হয়। এসে ভালোও লাগে। কেন জানেন তো ? এত নেই নেই এর মধ্যেও এখানে এমন একটা জিনিষ আছে যা আমরা আর কোথাও এত সহজে পেতে পারি না। সেটা যে কী এখন তা বলব না।

এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। এক বিধ্বংসী এ্যাকসিডেন্ট। একটা রেল আর একটা রেলকে সপাটে ধাক্কা মেরেছিল। আর ঠিক তখনই আমি কামরার খোলা দরজাটা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের লাইনের পাথরের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলাম। ব্যাস, তারপর আর কিছুই মনে নেই। নিশ্চয় ভাবছেন, ট্রেনে ক'রে আমি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছিলাম। কোথাও না—কোথাও যাচ্ছিলাম না। আমি তো রোজ ট্রেনের কামরাতেই ঘুরে বেড়াই। গান গাই। আমি ট্রেনের কামরায় গান ফেরি করে পেট চালাই। উঃ, কী খিদে। আর সেই খিদে নিয়েই আমি গান গাইতাম।

ভাবতেও হাসি পায়। আমার মুখের দিকে চেয়ে, আমার গান শুনে যারা তারিফ করত, তারা কেউই কিন্তু বুঝতে পারত না যে আমি কতদিন, কতরাত

ভাল ক'রে খেতে পাইনি। খিদেতে আমার পেটটা জলে যাচ্ছে। তাই যদি বুঝতো, তাহলে ওরা করুণা করতে—আমার হাতে দু একটা পয়সা দিতে অত দেরী করত কেন?

লাইনের পাথরের ওপর পড়ে কোঁকাচ্ছিলাম। এই সময় কারা যেন এসে আমাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেসল। যেদিন ভাল করে চোখ খুলল, দেখলাম একটু দূরেই কানাইদা, তার পাশে বলরাম সেই দূরে কাশীনাথ, এই রকম আরো কত সব চেনা চেনা মুখের ভিড়। কানাইদাকে চিনতে পারলেন না নিশ্চয়? একদিন আমাদের লাইনে বেড়াতে এলেই ওকে চিনে যাবেন। কানাইদা ইঁদুর মারা বিষ বিক্রি করে। দেখবেন একটা লোক হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল···খেলেই মরবে ··খেয়েছো কী মরেছো···নেবেন নাকি···লাগবে। ওই কানাই দা। বলরাম ধূপ বিক্রি করে। কাশীনাথ লজেন্স। জানেন, আমাদের কারোরই কিন্তু এইসব কাজ ভালো লাগে না। দিনরাত ঘুরে ঘুরে আমরা কেউ গান ফেরি করি, কেউ ধূপ...সে শুধুই পেটের খিদে মেটানোর জন্য। ইস্! কাল থেকে আবার সেই পেট চালানোর চিন্তা···আবার সেই খিদে···সেই অসহ্য খিদে···বাড়ি ফিরেই আমার মেয়েটার সেই বুক ফাটা চিৎকার···এই বাবা···বল্ না আমার জন্যে কী এনেছিস্··আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে। বউয়ের ডাগর চোখের সেই নীরব ক্ষুধার্ত চাহনি—উঃ। ভাবতেও কেমন গা ছম ছম করছে। আমি কী আর পারব···আবার গান গেয়ে ওদের পেটের ভাত যোগাড় ক'রতে? কে জানে···কিন্তু ছুটি তো আজ আমায় নিতেই হবে। আজই আমার ছুটি হবে।

যেদিন ভর্তি হয়েছিলাম, সেদিন আমাকে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিল, তখন আমার ডান—পা আর তিনটে পাঁজার ভাঙা, কপাল জুড়ে কালসিটে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। ডাক্তারবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলেছিলেন—'সবই সারবে, শুধু এই পায়ের হাড়টা জোড়া লাগতেই অনেক সময় নেবে।'

সত্যিই অনেক সময় নিল—দীর্ঘ পাঁচ মাস। মেয়েটা নিশ্চয় এতদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে...বউটা নিশ্চয়ই না খেয়ে খেয়ে আরো অনেক শুকিয়ে গেছে...কে জানে ওরা কী খেয়ে বেঁচে আছে...আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে...সেই আদিসপ্তগ্রাম। ওখান থেকে যে রোজ মেয়ে নিয়ে আমার বউ আমাকে দেখতে

আসবে...তা ভাবাই যায় না...যাক্‌গে। বলেছি তো আজ আমার আর কারোর উপর কোন অভিমান নেই। আজই তো আমার ছুটি হচ্ছে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। প্রথমে আমায় এঁরা ভর্তি নিয়েছিলেন মেঝেতে, আমার দু-পাশের খাটে দুজন রোগী। আর আমি তাদের মাঝখানে মেঝেতে শুয়ে থাকতাম। আমার গায়ে তাদের মুখ ধোয়া জল ছিটে লাগত। আমার মুখে তাদের ময়লা কাপড় চোপড় গুলো বারবারই আছড়ে পড়ত·····আমার পাতের মাছ বেড়ালটা সবার আগে চুরি ক'রে নিয়ে পালাত, সিস্টার ওষুধ দেবার সময় আমায় হারিয়ে ফেলত। ডাক্তারবাবু কোমর ভেঙে বসে আমায় ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে পারতেন না·· তবু আমি মেঝেতেই ছিলাম···কারণ তখন এখানে বেড খালি ছিল না। আজও নেই···কোনদিনই থাকবে না। দেশে আজ বেডের বড় অভাব। আমাদের ঠাঁই পাওয়া তাই এত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কী নিদারুণ অসুস্থ হয়েও মানুষ আজ তার স্থান খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন আমার মুখের উপর আছড়ে পড়ল উপরের রোগীর বেড প্যানটা। আমি চীৎকার করে উঠলাম...একী···এসব কী চলছে। ···ঠাকুর আমাকে মেরে ফেলো···ঠাকুর আমি আর বাঁচতে চাই না···এই অসহ্য লজ্জা, বেদনা, কোথায় রাখব ঠাকুর আমার মত একজন এতবড় করুণ রোগীর জন্যেও কী হাসপাতালে একটা বেড পাওয়া যাবে না?

ইস্, ওই শোন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১১টা বেজে গেল। একটু পরেই জানলা দিয়ে ঢুকে বুড়ো তালগাছের ছায়াটা মেঝেতে মাথা রাখবে। দু চারটে কাক আর শালিক ওর পাতায় বসে চিৎকার চেঁচামিচি জুড়ে দেবে। আর ঠিক তখনই আমার পেটের ভিতর হুঙ্কার দিয়ে উঠবে একটা দারুণ খিদে।

এখানে রোজ এই একই নিয়ম। এখানকার জগত চলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাড়ে এগারটা বাজলেই থালা পড়ে যাবে। জল পড়ে যাবে। ১২টার ঘরে কাঁটা দুটো ছুঁই ছুঁই করলেই থালায় ভাত পড়ে যাবে। একটা মাছ, তরকারি। আঃ, ভাবতেও ভাল লাগছে আর একটু পরেই আজকের ভাতটা পাওয়া যাবে।

ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, "আমাকে কী আর কিছুদিন এখানে রাখা যায় না? আরো কটা দিন? ডাক্তারবাবু আমার পায়ের প্লাস্টার-টা খুলতে খুলতে গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—'না আর একটা ঘণ্টাও না। রোগ সেরে

গেলেই এখান থেকে চলে যাওয়া নিয়ম কিন্তু কোথায় আমার রোগ সেরেছে? এখনও তো আমায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে। এখনও তো আমি পায়ে জোর পাই না। আর এই পা নিয়ে কী আমি ট্রেনের কামরায় ঘুরে ঘুরে গান গাইতে পারব? আমি কোথায় সেরেছি? আমি বাড়ি ফিরলেই তো আমার পেটের সেই রাক্ষুসে খিদেটা ফের আমাকে পাগল ক'রে তুলবে। শুধু পায়ের হাড় জুড়লেই কী মানুষের রোগ সারে? পেঠের খিদে জোড়াবার কী ব্যবস্থা দিচ্ছেন?

ডাক্তারবাবু আমার একটা কথাও শোনেন নি? তিনি পাশের বেডে চলে গেছলেন। সেখান থেকে তার পাশের বেডে। সেখান থেকে খোলা দরজার দিকে। হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু আমার প্রশ্নের জবাবটা না দিয়ে রোজই এইভাবেই চলে যেতেন, চলে যান···যাচ্ছেন।

কিন্তু আমার খিদের কী হবে? আজই তো আমার ছুটি হয়ে যাবে। আর কাল তো আবার খিদে-পাবে। তখন কে আমায় খেতে দেবে?

তোমাদের শুরুতেই বলেছিলাম না, এখানে কিছুই নেই। বেড না, ওষুধ না, সেবা না, শুশ্রূষা না। কিন্তু এমন একটা জিনিস এখানে পাওয়া যায়···যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেটা কী জানো তো ভাই?···দুবেলা দু থালা ভাত। বিশ্বাস করো, আমাদের সব রোগ শুধু সেইটার জোরেই সেরে যায়। সেইটার কামনাতেই আমরা এখানে পড়ে থাকতে চাই। অথচ ডাক্তারবাবুরা জানেনই না যে সেইটাই আমাদের সবার প্রধান ওষুধ। কী আশ্চর্য! ডাক্তার বাবু বলেছিলেন খিদেটা না কি কোন রোগই না। আমি সেদিন তাঁর মুখের উপর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম...খিদে পাওয়াটা কী কোন রোগ নয়? এই যে আমার এত খিদে পায়···সেটার কী কোন প্রতিকারই হবে না?

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন···খিদে না হওয়াটাই নাকি অসুখ···খিদে পাওয়াটা নয়। মানুষের খিদে না পেলে তার কারণ বার করতে তাঁরা গবেষণা করেন, খিদে পাচ্ছে না কেন? তার রোগটা কী। শুধু খিদে পাওয়ার জন্য নাকি কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি রাখা যায় না। ও কি। ন'নম্বর অমন হাঁফাচ্ছে কেন? ওর নাকে অক্সিজেন গোঁজা হয়েছে দেখছি? ও কি তবে চলল? ওর বুকটা অমন হাঁফরের মত ওঠানামা করছে কেন? ওর চোখের দৃষ্টিটা অমন গভীর সমুদ্রের মত ছায়া ঢাকা কেন? ও কি তবে ১২টার আগেই চলে যাবে? কিন্তু আর একটু অপেক্ষা করলেই তো ভাতটা এসে পড়বে।

বলাই···বলাই আমি বুঝতে পেরেছি তুই ঠিক আজ আমাদের ছেড়ে চলে যাবি। কিন্তু আর একটু দেরি করে গেলে হত না। একটু পরেই তো ভাত আসছে। দুটো ভাত মুখে দিয়ে যেতিস। মায়ের কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে··· মা বলতেন, "দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরো শক্তিপদ···দুটো ভাত খেয়ে যা···সেই আবার কখন খাওয়া জুটবে তার কী কোন ঠিক আছে···

বলাই, এখনি যাস্‌নি। কথাটা শোন···দুটো ভাত মুখে দিয়ে যা। আর একটু অপেক্ষা করে যা বলাই। তোর নাক থেকে নলটা ছুঁড়ে ফেলে দে··· হাত থেকে স্যালাইনটা খুলে ফ্যাল···আর ইনজেকশন্‌ নিসনি···লাথি মেরে সব ফেলে দিয়ে উঠে বোস···ওরা জানেনা তুই কী চাস···তোর কী চিকিৎসা··· অমন অভিমান ক'রে চলে যাসনি বলাই···ভাত তো আসবেই···ওই তো দেখা যাচ্ছে···ঘড়ির কাঁটাদুটো বারোটার ঘরে পৌঁছে গেল বলে···দুটো ভাত পেলেই আবার তুই সেরে উঠবি।

যাঃ বলাইটা চলে গেল। আমার কোন কথাই কানে তুলল না। ওঃ। কী অদ্ভুতভাবে এক পেট খিদে নিয়ে চলে গেল। আমিও তো চলে যাবো। বলাইয়ের পিছু পিছু আমরা সবাই ওই একই খিদে নিয়ে চলে যাচ্ছি। কাল থেকেই আবার একপেট খিদে নিয়ে গান গাইতে হবে। কিন্তু এইখানেই যদি চিরটাকাল কাটিয়ে দিতে পারতাম? যেখানে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাতের থালা এসে হাজির হয় কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব। ডাক্তারবাবু তো বলেই দিয়েছেন খিদে পাওয়াটা কোন রোগ নয়। তাই আমাদের মত অজস্র রোগী যাদের শুধু খিদে পাওয়াটা রোগ তারা আজ কেউ হাসপাতালে বেড পাবে না।

আজ হাসপাতালে স্থান পেতে গেলে খেতে হবে, প্রচুর খেতে হবে...খেয়ে পেটটা মোটা ক'রে ফেলতে হবে···লিভারটা পচিয়ে ফেলতে হবে, স্টমাকটাতে ঘা ক'রে ফেলতে হবে···তারপর আমার ছেলে কী মেয়ে, মা কী বউয়ের হাত ধরে হাসপাতালে এসে ডাক্তারবাবুকে কেঁদে কেঁদে বলতে হবে, 'আমার আজ আর মুখে কিছুই রোচেনা ডাক্তারবাবু···খাবার দেখলেই আমার বমি পায়··· আমি আর খেতে পারছি না...তখন আমায় হাসপাতালে ভর্তি করা হবে··· আমি সেদিন ঠিক বেড পাব···তখন আমাকে নিয়ে কত গবেষণা হবে···কারণ তখন যে আমি এক গভীর সমস্যা···তখনই যে আমি প্রকৃত রোগী...

আর তা না হলে ভাতের সন্ধানে পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে পা ভেঙে পাঁজরা ভেঙে তোমাকে হাসপাতালে আনা হলেও আবার তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে...তোমাকে ছুটি দেওয়া হবে আবার সেই ভাতেরই অনুসন্ধান করতে.....

ওঃ! কী প্রহসন! কী অবহেলা.....কী বিচার...

উঃ! অসহ্য ওই কান্না। তোমরা শুনতে পাচ্ছো...একটা শিশু কাঁদছে? ওই তো...ওই সামনের বাড়ির দোতালার জানলাটা থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে? হ্যাঁ, ওখানে এইমাত্র একটা শিশুর জন্ম হল। ওটা হাসপাতালের লেবার রুম।

তোমরা কী চিনতে পেরেছো...ওটা কার কান্না? বলাইয়ের। তখন কত ক'রে বললাম...বলাই দুটো ভাত মুখে দিয়ে যায় খালি পেটে চলে যাস্‌নি... আবার কখন ভাত জুটবে তার কী কোন ঠিক আছে? আর এখন দেখ ফিরে এসেই কেমন কান্না জুড়ে দিয়েছে। কাঁদে...কাঁদে। আর কেউ না পারুক আমি তোকে চিনতে পেরেছি...তুই বলাই। এক পেট খিদে নিয়ে মরে গিয়ে এখন জন্মেই আবার খিদের জন্যে কান্না জুড়ে দিয়েছিস।

বলাই আমাদের ক্ষমা কর। আমাকে এই মাত্র শুধু এক থালা ভাত দিয়ে গেছে। তা—ও শুধু এ বেলার মত। এর থেকে তোকেই বা কী দেব আর আমিই বা কী খাব।

বলাই আজও আমরা কেউ জানিনা, কবে আর কত দিন পরে তোকে জন্মেই আর খিদের জন্যে কাঁদতে হবে না। আজ আমার ছুটি। আজই আমি ফিরে যাচ্ছি ফের সেই ক্ষুধার রাজ্যে। আমাকে যে সেখানে ফিরে যেতেই হবে। কারণ সেখানে যে আমার কথা দেওয়া আছে...'আবার আসিব ফিরে..."

বলাই, এবার বড় হয়ে তুই ভাত দেবার হাসপাতাল খুলিস। শুধু খিদে মেটাবার ডাক্তার হোস। সেদিন এখানে তাহলে আর কারোর বেডের অভাব হবে না। পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে, পাঁজর ভেঙ্গে, পা ভেঙে আর কাউকে মেঝেতে পড়ে থাকতে হবে না বলাই আজও কেউ জানে না আমাদের অসুখ কী...আর তার ওষুধই বা কী···তুই আমাদের সবাইকে সেদিন ভাল ক'রে তুলিস আজ হাজার তর্ক করেও কাউকে বোঝাতে পারছি না যে খিদে পাওয়াটাই অসুখ— আমাদের জিতিয়ে দিস বলাই।

রাখাল বিশ্বাস কর্তৃক ৩২ গ্রীণ পার্ক কলকাতা ৫৬ থেকে প্রকাশিত ও জাগরণী প্রেস ৪০/১বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা ১২ থেকে মুদ্রিত।